দাম : দশ টাকা

মোদী-জমানায়
নারীর ক্ষমতায়ণ
পৃঃ - ১৪

স্বস্তিকা

নারী ক্ষমতায়ণের
পথে আজকের
ভারত
পৃঃ - ১১

৬৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ৫ ডিসেম্বর ২০১৬।। ১৯ অগ্রহায়ণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৫ ডিসেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : নোট বাতিলে ভোট বাতিল?

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

নারী ক্ষমতায়ণের পথে আজকের ভারত

▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ১১

মোদী জমানায় নারীর ক্ষমতায়ণ

▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

একটি মহিলা স্বনির্ভরতার কাহিনি

▯ শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ ▯ ১৮

বাংলার লক্ষ্মীবাঈ রানি ভবশঙ্করী

▯ মানস বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২১

ইসলামের অস্তিত্বেই সংকট

▯ হাসান সুরুর ▯ ২৭

মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ

▯ প্রণয় রায় ▯ ২৯

ভারতীয় চিত্রশিল্পে নারীর ক্ষমতায়ণ

▯ পর্ণা মুখার্জী ▯ ৩১

দিদি কোটিমাত্র বস্তাবৃত হইয়া

▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬ ▯ রঙ্গম : ৩৮-৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

চীনের দাদাগিরি

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে চীনই হলো সবচেয়ে বড় এবং প্রভাবশালী দেশ। কমিউনিস্ট শাসনে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকে চীন নানাভাবে ভারতকে সমস্যায় ফেলতে সবসময় সচেষ্ট। চীনের এই দাদাগিরি শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বের বহু দেশেরই ভ্রূকুঞ্চনের কারণ। এই প্রসঙ্গেই এবারের সংখ্যায় লিখেছেন প্রবাল চক্রবর্তী, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিচারবিভাগের সংস্কার শুধু চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

উচ্চ আদালতে বিচারপতিদের নিযুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সরকার ও বিচার বিভাগের মতানৈক্য আরও একবার প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িল। সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ন্যায়াধিকরণের অখিল ভারতীয় সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি টি.এস. ঠাকুর বলিয়াছেন, আদালতগুলিতে পাঁচশো-র বেশি বিচারপতির পদ এখনও শূন্য। অন্যদিকে এই সম্মেলনে উপস্থিত কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদের বক্তব্য, প্রশাসনিক কাজকর্মের এক্তিয়ার শুধু সরকারেরই রহিয়াছে। কেননা তাহারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। ঘটনা হইল ইতিপূর্বেও এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতেই এই প্রসঙ্গটি প্রধান বিচারপতি শ্রী ঠাকুর অত্যন্ত ভাবাবেগের সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইল, সরকার ও বিচারবিভাগের এই মতভেদ কবে শেষ হইবে? কতদিন নিজেদের বক্তব্যে অটল থাকিয়াই কর্তব্য সমাধা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে? সরকারের পক্ষে ইহা বোঝা দরকার যত দ্রুত সম্ভব বিচারবিভাগের সমস্যাগুলির সমাধান করা প্রয়োজন যাহাতে যথাসময়ে মানুষ ন্যায়বিচার লাভ করিতে পারে। অন্যদিকে বিচারবিভাগের পক্ষেও বোঝা দরকার সংস্কারের পথে দ্রুত অগ্রসর না হইলে মানুষের ক্ষোভ বাড়িবে বই কমিবে না। প্রধান বিচারপতি সঠিকই বলিয়াছেন যে সরকার যাহাতে লক্ষণরেখা অতিক্রম করিতে না পারে তাহার প্রতি নজর রাখাই বিচারবিভাগের কাজ। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে বিচারবিভাগের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণরেখা নাই। তাহারা সব কিছুই সঠিক করিতেছে এবং তাহাদের সব কিছু করিবার অধিকার আছে। ইহা কি উচিত—কীভাবে ব্যঙ্গচিত্র আঁকিতে হইবে সেই বিষয়েও সুপ্রিম কোর্ট রায় দিবে? বিকশিত গণতান্ত্রিক দেশে সুপ্রিম কোর্ট সাধারণত নির্বাচিত মামলারই শুনানি গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে জনস্বার্থের নামে প্রায় প্রত্যেক মামলাই শুনানির জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল, সুপ্রিম কোর্ট মাঝে মধ্যে এমন কিছু মন্তব্য করিতেছেন যাহা অনাবশ্যক। যেমন নোট বাতিলের প্রসঙ্গে সরকারকে সচেতন করিতে সুপ্রিম কোর্ট এমন পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা লাগিয়া যাইবে। শীর্ষ আদালতের পক্ষে এমন মন্তব্য কতটা উচিত তাহা বোঝা কঠিন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আদালতগুলিতে বিচারপতিদের বহু পদ শূন্য রহিয়াছে। ফলে বহু মামলা আটকাইয়া রহিয়াছে। যদিও আইনমন্ত্রী বলিয়াছেন যে তাহাদের সরকারই এই বছর সর্বাধিক বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছে। আইনমন্ত্রীর বক্তব্য স্বীকার করিয়াও বলিতে হয়, এখনও বহু বিচারপতির পদ শূন্য। বিচারপতির এই স্বল্পতা এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য বিচারবিভাগ সরকারকেই দায়ী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা বোঝা কঠিন, সুপ্রিম কোর্ট 'কলেজিয়াম' ব্যবস্থা সংস্কার করিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছেন না কেন? এই ব্যবস্থার সংশোধন যে জরুরি তাহা ইতিমধ্যে দুই বিচারপতিও উল্লেখ করিয়াছেন। তাই 'কলেজিয়াম' ব্যবস্থা সংস্কারই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিচারপতিদের শূন্য পদ পূরণ অবশ্যই প্রয়োজন। তবে তুলনায় গৌণ।

সরকারকেও বুঝিতে হইবে শুধু বিচারপতিদের শূন্য পদে নিযুক্ত করিলেই চলিবে না অন্যান্য আরও পদক্ষেপ, বিশেষত নিম্ন আদালতগুলির ক্ষেত্রে এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঘটনা হইল, নিম্ন আদালতগুলির সমস্যা লইয়া তেমন কেহ চিন্তিত নহে। সরকার নিজেদের অভিমত স্পষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট জানাক যে বিচারবিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে কী কী বাধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন সংস্কার হইতেছে, সেখানে বিচারবিভাগের সংস্কারের ক্ষেত্রে শুধু চর্চাই হইতেছে, কাজের কাজ কিছু হইতেছে না। ইহা কাম্য নহে।

সুভাষিতম্

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে।।
কেবলমাত্র শাস্ত্রবিচার করে কর্তব্য ঠিক করা অনুচিত। যুক্তিহীন সিদ্ধান্তের ফলে ধর্মহানি হয়ে থাকে।

আই এস জঙ্গি তৈরিতে জাকির নায়েকের স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজস্থানে পাকড়াও হওয়া জঙ্গি আবু আনিসকে জেরা করে তদন্তকারীরা জেনেছে, দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া বিতর্কিত ধর্মগুরু জাকির নায়েকের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের' (আইআরএফ) কাছ থেকে সে দু' দফায় দেড় লক্ষ টাকার স্কলারশিপ পেয়েছিল। আই আর এফ-এর অন্তর্গত সংস্থা ইউনাইটেড ইসলামিক এড-এর তরফে তাকে তিন কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হয়।

তদন্তে প্রকাশ এই অনুদান পাওয়ার সময় আনিস তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পুরোদস্তুর চাকরি করত। তাই স্কলারশিপের প্রয়োজন নিয়ে গোয়েন্দারা সন্দিহান হওয়ায় এই তথ্য উঠে আসে।

প্রসঙ্গত, জাকিরের আই আর এফ সংস্থা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার আগে থেকেই এই সংস্থাকে অফিস ভাড়া দেওয়ায় মালিকরা তাকে অফিস ছাড়ার নোটিস দিয়েছিল। জাকিরের কাজকর্মের আঁচ তারাও পাচ্ছিল। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, এন আই এ তিহার জেলে বন্দি আনিসকে জেরা করে জানতে পারে তার স্কলারশিপের শেষ কিস্তি আশি হাজার টাকা সে জঙ্গি আইএস সংগঠনে যোগ দিতে সিরিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময়ই পেয়েছিল। এই টাকা রাজস্থানের টঙ্ক শাখার আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয় বলে খবর। ঠিক এই সময়ই দেশ থেকে জাকিরের সংস্থার সহযোগে কাদের মহম্মদ ও আরশাদ আয়ব নামে আরও দুই যুবককে আই এস জঙ্গি বানাতে সিরিয়া পাঠানো হয়।

ইতিমধ্যে কুড়িটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে এনআইএ-র তদন্তকারী দল আইআরএফ-এর বিভিন্ন দপ্তর থেকে চোদ্দ লক্ষ নগদ ও জাকির নায়েকের দেশবিরোধী ও ধর্মীয় উস্কানিমূলক বক্তব্য সম্মিলিত কয়েক হাজার ডিভিডি ও টেপ উদ্ধার করেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে উদ্ধারকৃত দস্তাবেজের সঙ্গে গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে Rajiv Gandhi Charitable Trust-এর তরফে জাকিরের সংস্থার কাছ থেকে একাধিকবার অনুদান গ্রহণ সংক্রান্ত কাগজপত্র। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত একটি ট্রাস্টের এমন একটি দেশবিরোধী গোপন জঙ্গি সংগঠন পরিচালকের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ সামনে আসায় কংগ্রেস দলের ভাবমূর্তি চাপের মুখে পড়েছে বলে খবর। এনআইএ-র তদন্তে আরও প্রকাশ পেয়েছে সরাসরি নির্দিষ্ট ট্রাস্টের খাতায় জমা পড়ার বিপদ এড়াতে কোনো মধ্যস্থতাকারী সংস্থার মাধ্যমে এই টাকা আসত। আরজিসিটি-র ক্ষেত্রে এই টাকা এসেছিল মুম্বইয়ের 'এম এইচ সাবু সিদ্দিকি জেনারেল হসপিটালের' হাত ঘুরে। তদন্তে অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে কমলা নেহরু মেমোরিয়াল হসপিটাল সোসাইটির নামও চাঞ্চল্যকরভাবে উঠে এসেছে। ২০১১ সালে এই সমস্ত লেনদেনের সময় ও বর্তমানেও এই ট্রাস্টগুলির পরিচালকমণ্ডলীতে রয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। জাকিরের সংস্থা ধরা না পড়লে দেশবাসী হয়তো এমন সব কাজকর্ম সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যেত।

সংবিধানের ৩৭০ ধারা : বিচার করবে সুপ্রিম কোর্ট

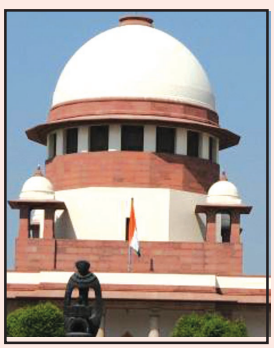

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংবিধানের ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের মানুষকে কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধে প্রদান করে, যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দারা পান না। কয়েক মাস আগে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষণ নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটি রায়ে জানিয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীরে ওই নীতি প্রযোজ্য নয়। তা না হলে ৩৭০ ধারা লঙ্ঘন করা হয়। হাইকোর্টের মতে ৩৭০ ধারা লঙ্ঘন করার ক্ষমতা সংবিধান কাউকে দেয়নি— এমনকী সংসদকেও নয়। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এস.এ. বোড়বে এবং অশোক ভূষণের যৌথ বেঞ্চ ৩৭০ ধারা বাতিল করা যাবে না— এমন অভিমতটি বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নোট বাতিলের প্রভাব : মহারাষ্ট্র পুরসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আনা বিরোধী দলগুলির অভিযোগের যে কোনো সারবত্তা নেই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল মহারাষ্ট্র পুরসভা নির্বাচনে। এখনও পর্যন্ত ১৪৭টি আসনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে যার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৫৭টি আসন এবং শিবসেনা ২৪টি আসন। অর্থাৎ বিজেপি জোটের দখলে এসেছে ৮১টি আসন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোট ২১২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, গণনা

এখনও বাকি থাকলেও প্রথম পর্যায়ের গণনার পর যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে বিজেপি জোটের ক্ষমতায় আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত লাগু হবার পর দেশে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটির 'বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা' বলে বর্ণনা করেছে ভারতীয় মিডিয়া। বিজেপি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, সাধারণ মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবেন— এমন একটা ধারণা জনমানসে তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে অসম, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে, এখন মহারাষ্ট্রের নির্বাচন দেখিয়ে দিল কালোটাকার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ধর্মযুদ্ধে মানুষের সায় আছে। সাময়িক অসুবিধেকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরছেন না। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে, বিদর্ভ অঞ্চলে মিডিয়ার প্রচারিত 'অপরাজেয়' কংগ্রেস ধরাশায়ী হয়েছে। বিজেপি পেয়েছে ২৫টি আসন, শিবসেনা ৪টি। পশ্চিম মহারাষ্ট্রেও বিজেপি জোটের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। সেখানে বিজেপি পেয়েছে ১১টি আসন এবং উত্তর মহারাষ্ট্রে ৯টি। কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। যদিও এনসিপি এখনও পর্যন্ত খাতা খুলতে পারেনি।

অসাধারণ ফলাফলের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং দলের রাজ্য সম্পাদক রাওসাহেব দানভেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে, অন্য একটি টুইটার-বার্তায় ধর্মযুদ্ধে কেন্দ্রকে সমর্থন করার জন্য মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলেন, 'কালোটাকার পাহাড়ে বসে থাকা যে সব রাজনৈতিক দল নিজেরা বাঁচতে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের ফল থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।'

কলেজিয়াম সংস্কার

চেলামেশ্বরের পাশে হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কলেজিয়াম সংস্কারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে. চেলামেশ্বর আরও একজনকে পাশে পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের ২৪টি হাইকোর্টে কলেজিয়ামের সুপারিশ করা বিচারপতিদেরই নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি চেলামেশ্বর গত কয়েক মাস ধরে কলেজিয়ামের কোনো বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কলেজিয়ামের সংস্কার করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি দিল্লী হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং ল কমিশনের চেয়ারম্যান এ পি শাহ্ একই দাবি তুলে চেলামেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কলেজিয়ামকে 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিবর্জিত' বলে বর্ণনা করে বলেন, 'কলেজিয়াম তার ন্যূনতম স্বচ্ছতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে'।

কোচিতে আয়োজিত কৃষ্ণ আইয়ার স্মৃতিভাষণে এ পি শাহ্ বলেন, 'যে পদ্ধতিতে কলেজিয়াম এখন নিয়োগ করে তা আর চলতে দেওয়া যায় না। উপযুক্ত বিকল্পের জন্য অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। কলেজিয়ামের বৈঠকে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচারপতি চেলামেশ্বর ঠিকই করেছেন।' কথাপ্রসঙ্গে সংবিধান রচনার অন্যতম স্থপতি ড. বি আর আম্বেদকরের কথা তিনি মনে করিয়ে দেন। বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে বি. আর আম্বেদকর কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদানের বিরোধী ছিলেন। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা সরকার— সবাইকে তিনি এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সখেদে বলেন, 'বিচারপতি নিয়োগে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। কলেজিয়ামের নিজস্ব কোনো অফিস নেই, কর্মী নেই, কার্যপ্রণালী নেই, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কোনো ব্যবস্থা নেই— এক কথায় নিয়োগের কোনো পরিকাঠামোই নেই।' পুরো পদ্ধতিটাই 'অ্যাডহক' বলে তিনি বর্ণনা করেন।

নোট বাতিলের প্রভাব

এক মাসে সর্বাধিক মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অনেকদিন ধরেই রাজ্যে রাজ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। চাপ বাড়িয়ে চলেছে নিরাপত্তাবাহিনীও। কিন্তু কেন্দ্রের সাম্প্রতিক নোট বাতিলের প্রভাবে যা হলো তা বোধহয় আগে কখনো হয়নি। গত ২৮ দিনে সমর্থক-সহ ৫৬৪ জন মাওবাদী উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এর আগে এক মাসে এত বিপুল সংখ্যক মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেনি।

ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশের লাগাতার জীবনপণ সংগ্রামের কথা মাথায় রেখেও বলা চলে নোট

বাতিলের সিদ্ধান্তে মাওবাদীদের অস্তিত্ব চরম সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। ৫৬৪ জন মাওবাদী উগ্রপন্থীর মধ্যে ৪৬৯ জন আত্মসমর্পণ করেছে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত লাগু হবার পর। ওড়িশার মালকানগিরি জেলায় সর্বাধিক ৭০ শতাংশ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপুলিশের উগ্রপন্থী দমন শাখা গ্রে হাউন্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৩ জন মাওবাদী।

গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, মাত্র আটাশ দিনে এত মাওবাদী কখনও অস্ত্রত্যাগ করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১৬-র ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৩৭৬৬ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। শুধু ২০১৬-য় করেছে ১৩৯৯৯ জন, যা গত ছ' বছরে সর্বাধিক। সি আর পি এফ-এর পদস্থ আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, মাওবাদী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি উন্নয়মূলক কর্মসূচিতে গুরুত্ব দেওয়ায় উগ্রপন্থীরা আর আগের মতো স্থানীয় মানুষের সাহায্য পাচ্ছে না। তার ওপর, কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাদের পক্ষে নোট বদল করা সহজ হচ্ছে না। বন্দুক, গোলাবারুদ ওষুধপত্র এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র কেনা প্রায় লাটে উঠেছে।

নিঃসন্দেহে মাওবাদীরা চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে। কথাটা স্বীকার করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল কে. দুর্গা বলেন, 'নকশালরা এখন আতঙ্কিত। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনোও পথ খোলা নেই।'

মাদ্রাসায় শুক্রবার ছুটি দেওয়া যাবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের বেশ কিছু মাদ্রাসায় ছুটির দিন শুক্রবার। অসমের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ভারতে ছুটির দিন যেহেতু রবিবার, তাই মাদ্রাসায় শুক্রবার ছুটি দেওয়া যাবে না। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'আমরা খবর পেয়েছি রাজ্যের কয়েকটি মাদ্রাসা শুক্রবারে বন্ধ থাকে। সারা দেশে ছুটির দিন রবিবার। এই সব বেআইনি কাজ এখনই বন্ধ না করলে সরকার মাদ্রাসাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।'

সাংসদদের লেনদেনের তথ্য চাইলেন মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বিরোধী রাজনীতির ভিত কাঁপিয়ে দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও একটি

অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিলেন। ৮ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে লেনদেন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি জমা দেওয়ার জন্য দলের প্রতিটি বিধায়ক ও সাংসদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১ জানুয়ারির মধ্যে দলের সভাপতি অমিত শাহের কাছে তথ্য জমা দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ শুনে বিরোধীরা যথারীতি হৈচৈ বাঁধিয়ে দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, বিরোধীরা চাইলে প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

নোট বাতিলে ভোট বাতিল ?

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী
দিদি,

মোদী কিন্তু ভাল করছেন না। রাতারাতি নোট বাতিল মোটেই ভাল কাজ নয়। আপনি ৭২ ঘণ্টা সময় দেওয়ার কথা বলছিলেন। কিন্তু মোদী বলছেন, এই সময় দিলে কোনোভাবে নোট বাতিলের উপযোগিতাকে লাগু করা যেত না। অনেকেই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিত। তিনি আরও বলেছেন, 'যাঁরা নোটবাতিলের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের সকলেরই একটাই সমস্যা যে এঁরা নিজেদের প্রস্তুতি সারতে পারেননি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বক্তব্যে আরও জানান যে, 'আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দুর্নীতির তালিকায় যেভাবে ভারতকে স্থান দেওয়া হচ্ছে তা উদ্বেগের। এই পরিস্থিতির বদল না এলে সামনে আরও ভয়ঙ্কর দিন আসছে।'

দিদি, সত্যিই এটা অন্যায়। একটুও ঘর গুছানোর সময় দিলেন না নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন, 'গ্রামের নিরক্ষর মানুষেরাও এখন স্মার্টফোন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ফেসবুক এবং হোয়াটস্অ্যাপও করছেন তাঁরা। সুতরাং, প্রযুক্তির সুবিধায় এঁদেরকে দিশা দেখাতে পারলে দেশের বুক থেকে আর্থিক দুর্নীতির মাত্রাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।' কিন্তু সেটা হলে আপনাদের কী করে চলবে সেটা একটু বুঝলেন না। কেজরিবালের এনজিওর টাকা, আপনার সারদা টাকা, তোলার টাকা, সিন্ডিকেটের টাকা তো আর অনলাইনে সম্ভব নয়। মোদী এটাই বুঝছেন না যে, অনলাইনে পার্টি ফান্ডে ঘুষ দেওয়া যায় না। মোদী বুঝছেন না একশ দিনের কাজের টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কে গেলে আপনার দল চলবে কী করে?

আমার তো মনে হয়, বেশি করে আপনাকে বাগে আনতেই মোদী গোটা দেশকে দুর্ভোগে ফেলেছেন। যদিও বোকা দেশবাসী নিজেদের দুর্ভোগ নিজেরাই বুঝতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গ যে কালো টাকায় দেশের এক নম্বর হয়ে উঠেছে এটাই মোদী মেনে নিতে পারেননি। তিনি আগেই এমন সম্ভাবনার কথা বলেছেন। বলেছেন অর্থমন্ত্রী জেটলিও। সকলেরই আশঙ্কা ছিল প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্পের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত টাকা জমতে পারে। এমন হলে আইনি সমস্যা হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু প্রথম ১৩ দিনের হিসেবে দেখা গিয়েছে আশঙ্কাকে সত্যি করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গিয়েছে গরিবের অ্যাকাউন্ট।

জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টে মাত্র ১৩ দিনে জমা পড়েছে ২১ হাজার কোটি টাকা। এটা গোটা দেশের হিসেব। সারা দেশে জনধন প্রকল্পের অ্যাকাউন্ট হয়েছে ২৫ কোটি ৫১ লক্ষ। এই অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী নোট বাতিলের ঘোষণা করার আগে মোট জমা ছিল ৪৫,৬৩৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। আর ৯ নভেম্বরের পরে মোট জমা টাকার পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩৬ কোটি টাকা। আর অর্থমন্ত্রকের হিসেব বলছে, গরিবের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ার পরিমাণে দেখা গিয়েছে সবার উপরে পশ্চিমবঙ্গ। এর পিছনেই রয়েছে কর্ণাটক।

দেশের প্রত্যেক পরিবারে কমপক্ষে একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাতে থাকে তার জন্য মোদী সরকার এই প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে গরিব মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার সুযোগও দিয়েছে কেন্দ্র। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট এই প্রকল্প শুরু হয়। এখন দেখা যাচ্ছে এক ঝটকায় এ রাজ্যে গরিবের সংখ্যা কমে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের থেকেও গরিবের সেভিংস অ্যাকাউন্টে বেশি টাকা। আসল কারণ, তৃণমূল নেতাদের কালো টাকা রাখতে নিজেদের অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিতে বাধ্য হচ্ছেন গরিব মানুষ।

গরিব মানুষকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার জন্য তৈরি এই অ্যাকাউন্ট মালিকদের বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হয়। একশ দিনের কাজের টাকা, গ্যাসের ভরতুকি থেকে কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকাও আসে ওই অ্যাকাউন্টে। সামান্য খরচে বিমার সুযোগ দেওয়া ছাড়াও ওই অ্যাকাউন্ট মালিকদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফট-এরও সুযোগ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারও কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রীর টাকা ওই অ্যাকাউন্টেই জমা দেয়। এখন ওই প্রকল্পের আওতায় থাকা যাদের অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা জমা পড়েছে তারা আর এই সমস্ত সুযোগ পাওয়ার অধিকারী কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। যদি গরিব হিসেবে তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য কে দায়ী হবেন দিদি, নরেন্দ্র মোদী?

—**সুন্দর মৌলিক**

চীনের সরকারি মুখপত্রে মোদীর প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে 'সাহসী' আখ্যা দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করল চীনের সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস্। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ অচিরেই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং তা থেকে শিক্ষা নেবে চীনও, সংবাদপত্রটির সম্পাদকীয় নিবন্ধে একথা লেখা হয়েছে। নিবন্ধকার লিখেছেন, 'অর্থ সংস্কারের নিয়ম মেনে মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখার জন্যেই আগে থেকে কিছু জানতে দেওয়া হয়নি।' তার মন্তব্য, 'এ কথা ঠিক, ভারতে ৯০ শতাংশ আর্থিক লেনদেন নগদে হয়। সুতরাং ৮৫ শতাংশ নোট বাতিল করে দিলে মানুষের অসুবিধে হবেই। ৫০ এবং ১০০ ইয়েনের নোট বাতিল করে দিলে চীনেও একই অবস্থা হবে। কিন্তু মানুষের অসুবিধে না ঘটিয়ে সংস্কার কীভাবে সম্ভব!' শেষ অনুচ্ছেদে নিবন্ধকারের ঘোষণা, 'নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তটি সাহসী। আমরাও এর ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করছি।' তবে প্রশংসা করলেও, ভারতে যেহেতু 'পশ্চিমি ধাঁচের গণতন্ত্র' বর্তমান, তাই এই ধরনের সিদ্ধান্তকে যে অহেতুক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হবে, সে ব্যাপারেও সাবধান করা হয়েছে নিবন্ধে।

উবাচ

"সবার ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্মণরেখা থাকা প্রয়োজন। বিচারপতিরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁদের মনে রাখা উচিত আত্মবিশ্লেষণ সকলকেই করতে হয়।"

মুকুল রোহতাগি
অ্যাটর্নি জেনারেল

বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য প্রসঙ্গে।

"এ বছর ১২০ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। এর থেকে বেশি নিয়োগ (১২১ জন) ২০১৩ সালে হয়েছিল। ১৯৯০ সালের পর থেকে গড়ে প্রতি বছর ৯০ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়ে থাকে।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য প্রসঙ্গে।

"বামেদের ডাকা ভারত বনধ্ সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হয়েছে। জনজীবন একেবারে স্বাভাবিক ছিল। বাস্তবে ভারতের জনগণ কালো টাকার বিপক্ষে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছে।"

ডাঃ হর্ষবর্ধন
বিজ্ঞান ও কারিগরী দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বামেদের ডাকা ভারতবনধ্ প্রসঙ্গে।

"কিছু মানুষের 'চলতা হ্যায়' মানসিকতা আর চলবে না। যদিও আমি মনে করি না কাল থেকে সারা পৃথিবী দুর্নীতিমুক্ত হয়ে যাবে। কিংবা সকলে সৎভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করবেন। কিন্তু এরকম একটা সুযোগ মানুষ সারা জীবনে একবার মাত্র পায়। যে সুযোগ প্রত্যেক ভারতীয়কে একটু অন্যভাবে ভাবতে সাহায্য করবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য গর্ব করার মতো কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে প্রেরণা জোগাবে।"

পীযূষ গোয়েল
রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বিদ্যুৎ কয়লা ও নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক

কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।

নারী ক্ষমতায়ণের পথে আজকের ভারত

সুতপা বসাক ভড়

গণতন্ত্র দিবসে উইং কমান্ডার পূজা ঠাকুরের নেতৃত্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৪৭ শতাংশ মহিলা। এদের ওপরেই পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র দেশের পূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেক সমস্যা আছে, যেমন— দারিদ্র্য, অপুষ্টি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ, বিক্ষিপ্ত যুবসমাজ, সাইবার ক্রাইম, মেয়ে পাচার, বাচ্চাদের ওপর অত্যাচার, বয়স্ক মা-বাবার প্রতি অবহেলা, নেশা ভাং, পণপ্রথা, বধু-নির্যাতন ইত্যাদি। আমরা যদি ভালভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে, দেশে সামগ্রিকভাবে নারীর প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলাই জন্ম দিয়েছে উপরোক্ত সমস্যাগুলির। সুতরাং, নারী ক্ষমতায়ণের প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র নারীদেরই শক্তিশালী করছে না বা করবে না— প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র দেশ উপকৃত হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সমাজে মহিলাদের স্থান ছিল সম্মানজনক। মৈত্রেয়ী, লীলাবতী, গার্গী, বাচক্নবী— এঁরা নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, সংস্কার এবং পাণ্ডিত্য দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। পরে বিদেশি আক্রমণ এবং অনুপ্রবেশের সঙ্গে নারীরা ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠিত হয়ে ঘরের ভেতর নিজেদের সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তার ওপর গোঁড়া সমাজ নানান নিষেধাজ্ঞা জারি করে মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার সবকিছুই সীমিত করে দেয়। ফলে তারা পরমুখাপেক্ষী এবং পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। কুপ্রথা আর ভ্রষ্ট রীতিনীতি সমাজব্যবস্থাকে আরও কলুষিত করে দেয়। সতীপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দেবদাসী, নগরসুন্দরী ইত্যাদি প্রথার বিষাক্ত দংশনে যখন হিন্দুসমাজ দিশাহীন, তখন এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বরা। যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজে নারীর স্থান আগের থেকে অনেকটাই ভাল হয়। সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

নারী ক্ষমতায়ণ একটি বহুমুখী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মহিলাদের এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ফেলে নিজের ভেতরের শক্তিকে চিনতে পারে— জানতে পারে। এটা তখনই সম্ভব যখন তাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা ও সংস্কার দেওয়া হবে; জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্বও তাদের ওপরেই ছেড়ে দিতে হবে। তবেই তারা আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। সমাজের উন্নতিতে মহিলাদের অবদান অপরিমেয়। সেজন্য তাদের সুশিক্ষা, সংস্কার দেওয়া অত্যাবশ্যক। এই পরিকল্পনা সময়সাপেক্ষ; তাই মহিলাদের শক্তিশালী করতে হলে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগ খুবই জরুরি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা :

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নারী ক্ষমতায়ণকে দেশের প্রগতির অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হিসাবে মেনে নিয়ে কাজ করে চলেছে। একজন মহিলা সেনা আধিকারিদের নেতৃত্বে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বরাক ওবামাকে গার্ড অফ অনার দিয়ে এর সূচনা করা

হয়েছিল। এরপর কোনো নাবালক যদি দুষ্কর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে সে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে— এমন আইন হলো। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ফলে গর্ভস্থ কন্যাসন্তানটি আগের থেকে আজ নিরাপদ। মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে পরিবার বিশেষ করে মায়েরা এগিয়ে এসে উৎসাহ দিচ্ছেন। স্বচ্ছতা অভিযান এবং বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আগে গ্রামের দিকে একটু বড় হলে শৌচালয় না তৈরি লজ্জা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার মেয়েরাই বেশি হোত। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে শৌচালয় তৈরির এবং ব্যবহার করার আগ্রহ মহিলাদের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে শৌচালয় বানাবার জন্য আর্থিক ঘোষণার ফলে বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহার ব্যাপক হারে বেড়েছে। মহিলাদের শিক্ষাস্তরেরও আগের থেকে উন্নতি হয়েছে। মোদী সরকার দোভাষী হিসাবে মহিলাদের নিযুক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে হরিয়ানা সরকার একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। ওই রাজ্যে সরকার থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ এবং ব্যবহার অনিবার্য করেছে। বিরোধী পক্ষ বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিয়ে গেলে সেখান থেকে নির্দেশ আসে যে শিক্ষা এবং স্বচ্ছতা দুটিই জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। হরিয়ানাতে বাড়ির নেমপ্লেটে মেয়েদের নাম লেখা শুরু হয়েছে।

সরকারের 'সেলফি উইথ ডটার' উদ্যোগে মেয়ের জন্য অভিভাবকদের গর্ববোধ ধরা পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের যৌনশোষণ বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে ছলনা বা বৈবাহিক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাতে তাদের ঠকানো না যায়, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারি অফিসে কর্মরতা মহিলাদের জন্য মাতৃত্বের অবকাশ ছ'মাস থেকে বাড়িয়ে আটমাস করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

বর্তমান সরকার মহিলাদের জন্য এমন একটি আইনি ব্যবস্থা আনতে চাইছে, যার প্রয়োগের ফলে স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অথবা কোনো কারণে যদি বিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব (ব্যয়) স্বামীকেই বহন করতে হবে। তিন- তালাকের বলি মুসলমান মহিলাদের দুর্দশার উপশম করতেও কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হয়েছে। কোনো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের নামে মহিলাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসা এই ঘৃণ্য প্রথাটি বন্ধ করার জন্য অগ্রণী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য 'মাইনরিটিজ অফ্ দ্য মাইনরিটি'-র সঙ্গে যাতে অন্যায়-অবিচার না হয় সেজন্য চেষ্টা করছে।

সামাজিক স্থিতি :

স্বাধীন ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে মহিলা ক্ষমতায়ণের জন্য এত প্রকল্প আগে কখনও নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। শুধু তাই নয়, প্রকল্পগুলি যাতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়, জনসাধারণ যাতে এই প্রকল্পগুলিতে এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করে, সেই উদ্দেশ্যেও সারা দেশে নানান উৎসাহমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়েছে। তবুও আশানুরূপ ফল এখনও ফলতে শুরু করেনি। গরিব পরিবারের ছোট ছোট মেয়েরা মা'র হাত ধরে সকালবেলা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসে। আমরাও চোখ বুজে ওদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিই। এক্ষেত্রে আইন নয়, মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা যদি ওই ছোট্ট মেয়েদের দিয়ে কাজ না করাই, তাহলে ওদের মা'রাও সঙ্গে করে আনবে না; বরং ওই সময় তারা লেখাপড়া শিখবে, খেলাধুলো করবে— এটাই স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে সব থেকে বেশি বাল্যবিবাহ হয় ভারতে। আইন কানুনের বিধি-নিষেধ

ছাগল বিক্রির টাকায় শৌচালয় : মোদীর প্রচারে কুঁবর বাঈকে।

সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। বিয়ের পর অধিকাংশ নাবালিকা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। বেশিরভাগই আঠারো বছর বয়সের আগেই 'মা' হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি মা এবং নবজাত শিশু উভয়ের জন্যই অস্বাস্থ্যকর। লেখাপড়া, খেলাধুলো করার সময় ওইসব নাবালিকারা ঘর-সংসারের কাজ করতে বাধ্য হয়।

পণপ্রথার মতো ঘৃণ্য একটি প্রথা আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। এর ফলে কত মেয়ে, পরিবার যে শেষ হয়ে যাচ্ছে— তার ঠিকানা নেই। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত পরিবারেই কমবেশি এই প্রথার প্রচলন আছে। আমরা সবাই জানি, অথচ চুপ করে থাকি। এই প্রথার নিষ্পত্তি কেবলমাত্র আইন বা পুলিশ করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন আমাদের সবার সুস্থ মানসিকতার।

যৌনবিকৃতির শিকার বেশিরভাগ মেয়ে তাদের অতি পরিচিত গণ্ডীর মধ্যেই হয়। কোন্ আইন এটা রোধ করতে পারবে? ছোট মেয়ে থেকে শুরু করে বয়স্কারাও ওই ফাঁদের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খায়। লজ্জা- সঙ্কোচবশত সবসময় প্রকাশ করতেও পারে না। সভ্য, ভদ্র, চেনা, পরিচিত মুখের আড়ালে ওই বীভৎস রূপ পুষে রাখা জানোয়ারদের কোন্ আইন শাস্তি দেবে?

এরপর আবার মহিলারা কথ্য ভাষায় 'মেয়েছেলে'! এইভাবে বললে কিছু পুরুষমানুষের আত্মতুষ্টি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাদের সব ক্রিয়াকলাপ 'মেয়েছেলের কাজ', 'মেয়েছেলের কথা'— সেদিকে দৃষ্টি দিলে বা কর্ণপাত করলে পুরুষত্বে বাধে। সেজন্য সোজা কথায় তাদের থেকে কাজ নাও আর অবহেলা করো--- এমন মানসিকতা এখনও কিছু পুরুষমানুষের আছে। তাদের এই ধরনের হীন চিন্তা- ভাবনা কে বদলাবে? পরিবারের একজন পুরুষসদস্য অসুস্থ হলে তার যা সেবা-শুশ্রূষা হয়, তার সিকিভাগও কি ওই পরিবারের মহিলা সদস্যরা অসুস্থ হলে জোটে? পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মহিলাদের মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়? আজকের দিনেও অনেক পুরুষমানুষ মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। মহিলারা কেবলমাত্র ঘরে থাকবে আর পুরুষের প্রয়োজনে আসবে এমন মানসিকতার প্রমাণ সমাজে প্রচুর আছে। অনেকে যাও বা মেনে নেয়, তাও ঘরের কাজের ক্ষেত্রে কোনোরকম আপোশ করবে না। কোনো পরিস্থিতিতেই মহিলাদের কাজে সাহায্য করবে না; অথচ বাইরে আলোচনাসভায় ওইসব লোকেরাই নারীর উন্নতি, নারী জাগরণ, নারী ক্ষমতায়ণের ওপর বড় বড় কথা বলেন। কোন্ আইন এদের এই দ্বি-মুখী মানসিকতার পরিবর্তন করবে?

সচেতনতা বাড়ছে :

এত কিছু সত্ত্বেও সমাজে সচেতনতা আসছে। আর এই সচেতনতা বাড়ছে মূলত মহিলাদের মধ্যে। এজন্য কৃতিত্ব নিশ্চয়ই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া উচিত। যখন দেখি হিমাচল প্রদেশের একটি ব্লকে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে হিজরেরা যায় কন্যার মাকে অভিনন্দন জানাতে, তখন বোঝা যায় যে সচেতনতা শুরু হয়েছে। রাজস্থানে পিপলন্তরী গ্রামে কন্যাসন্তান জন্মালে গাছ লাগানো হয়। উচ্চ শিক্ষাতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখনীয়ভাবে বাড়ছে। যখন দেখি দেশের প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের জন্য বিশেষ অর্থসঞ্চয়ের যোজনা আনছেন, মেয়েদের অসুবিধার কথা ভেবে বিদ্যালয়ে শৌচালয় বানানোর জন্য জোর দিচ্ছেন, গরিব মহিলাদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রেখে নিঃশুল্ক রান্নার গ্যাসের কানেকশান দেবার ব্যবস্থা করছেন, গরিব বৃদ্ধা কুংবর বাঈ ছাগল বিক্রি করে শৌচালয় বানিয়েছেন বলে তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম জানাচ্ছেন, কখনও বা শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সুদূর লাহুল-স্পীতির ছাত্রীদের উৎসাহবর্ধন করছেন, তখন আশার আলো জ্বলে ওঠে। সমাজে এই পরিবর্তন আসা খুবই প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশজীর একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'আমি কৃতজ্ঞ আমার দিদিমার কাছে। তাঁর জন্যই আমি আমার মাকে পেয়েছি।'

অলিম্পিকে আমাদের মুখরক্ষা করেছে দেশের তিন কন্যারত্ন। ক্রীড়াজগতে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে নিজেদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দীপা কর্মকার, সাক্ষী মালিক এবং পিভি সিঁধু। আজ আমরা গর্বিত এই মেয়েদের জন্য।

একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা যতই বড় বড় কথা বলি বা বড় বড় কাজ করি না কেন, মহিলাদের যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান না দিই, তাহলে সব বৃথা। মেয়েদের সম্মানের সঙ্গে বড় হতে দিতে হবে। তবেই তাদের মধ্যে আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাসের জন্ম হবে। তখন মেয়েরা নিজেই স্থির করতে পারবে তার কর্তব্য এবং পারবে তার কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। ফলে সমাজ উপকৃত হবে। সমাজের প্রায় অর্ধেক শক্তি নারীর হাতে। ওই অর্ধেক শক্তিকে যদি আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিই, তবে তা পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র দেশের উন্নতিকল্পে সমর্পিত হবে। ।

মোদী জমানায় নারীর ক্ষমতায়ণ

সন্দীপ চক্রবর্তী

স্বাধীনতার পর থেকে এই ২০১৬ অবধি যতগুলি কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতাসীন হয়েছে নারীকল্যাণ এবং উন্নয়নের ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে কেউই কসুর করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ভাবনা এবং তার রূপায়ণ সর্বত্রগামী হয়নি। হয় তা আটকে থেকেছে বড় বড় শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে, নয়তো প্রান্তিক মহিলাদের একটি ক্ষুদ্র অংশের রুটিরুজির ব্যবস্থা করেই হাত গুটিয়েছে। নারীকল্যাণের সঙ্গে যে নারীর নিরাপত্তার সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ণ আদপেই সম্ভব নয় সেটা বোধহয় নরেন্দ্র মোদীর আগে তেমন করে কেউ বোঝেননি। ক্ষমতায় এসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং উজালার মতো প্রকল্পের কথা। ভারতে নারীর ক্ষমতায়ণের ইতিহাসে প্রকল্পদুটি বিশেষ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের উদ্বোধন।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও

প্রতি হাজার পুরুষশিশুর অনুপাতে মহিলাশিশুর সংখ্যা অনুযায়ী শিশু যৌনতা সূচক স্থির করার রেওয়াজ সারা বিশ্বে প্রচলিত। ১৯৯১ সালে ভারতে শিশু যৌনতা সূচক ছিল ৯৪৫। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষশিশুর পাশে মেয়েশিশুর সংখ্যা ছিল ৯৪৫। পরে ২০০১ সালে তা কমে হয় ৯২৭ এবং ২০১১ সালে ৯১৮। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর একদশকে ভারতে নারীর ক্ষমতায়ণের হাল কী ছিল তা এই তথ্য থেকে পরিষ্কার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে নানারকম নগদ অনুদানের ব্যবস্থা করে— এমনকী কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে সেই পরিবারকে নগদ পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেও কন্যাভ্রূণ হত্যার বিপজ্জনক প্রবণতা বন্ধ করতে পারেনি। এর কারণ সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। টাকা দিয়ে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। এমনই এক নৈরাশ্যজনক প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের প্রস্তাবনায় মানুষের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সুষ্ঠু সমাজসৃজনে মেয়েদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে নারীশিক্ষা এবং নারীর স্বাস্থ্যবিধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, মেয়েদের ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে সমাজ মেয়েদের দায় হিসেবে না দেখে। কিংবা, বিরাট একটা আর্থিক বোঝা দীর্ঘদিন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে বলে লিঙ্গনির্ধারণ করে ভ্রূণ অবস্থাতেই না মেরে ফেলে।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের মূল লক্ষ্য লিঙ্গনির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ করা এবং মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে তাদের উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সেইসঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির নানারকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় সরকার চায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলছুটের সংখ্যা কমিয়ে মেয়েদের সার্বিক শিক্ষার হার (সার দেশে) ৭৬ শতাংশে নিয়ে যেতে।

একথা অনস্বীকার্য, মেয়েদের স্কুলে ভর্তির হার আগের থেকে বেড়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই হার এখন ৯০.৩ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৭৩.৭ শতাংশ। কিন্তু ভর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্কুল পালানোর হারও। স্কুলছুটের হার উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২.৯ শতাংশ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৬.৭ শতাংশ। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, অল্পবয়েসে বিয়ে, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা,বাড়ির কাজ এবং কাজের খোঁজে বাবা-মার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য মেয়েদের

পড়াশোনা সাধারণত বন্ধ করে দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশে অতিরিক্ত আর একটি সমস্যা বর্তমান। সেখানে যৌন নিরাপত্তার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন বাবা-মা তাঁদের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠরতা কন্যাসন্তানের পড়াশোনায় ইতি টেনে দেন।

মহিলা ও পুরুষশিশুর মধ্যে তৈরি হওয়া দুস্তর সামাজিক ব্যবধান কমাতে এবং লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্প সফল হবে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পের টাকা মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বে পৌঁছত। তার থেকেও বড়ো কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই টাকায় স্কুলের চুনকাম, পাঁচিল বা টয়লেট তৈরি, ব্ল্যাকবোর্ড বা ডাস্টার কেনার মতো কাজ করা হোত। এক শ্রেণীর আমলা এবং স্থানীয় দলদাস প্রশাসনের ষড়যন্ত্রে বঞ্চিত হোত মেয়েরা।

স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব এবং নিরাপত্তার কারণে যাতে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ না হয় তার জন্য মোদী সরকার সারা দেশে ৫০০টি ছাত্রীনিবাস বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে পাঁচটি রাজ্যে শিশুযৌনতা সূচক সব থেকে করুণ তাদের মধ্যে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ এখনও পর্যন্ত ছাত্রীনিবাসের জন্য আবেদন করেছে। রাজ্যগুলি সহযোগিতা না করলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর হবার পর এই প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। কারণ তখন রাজস্ব আদায়ে রাজ্যের অংশীদারিত্ব ৩২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪২ শতাংশ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা স্থির করবে রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রকল্পে অনুদান হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের অনুদান ২৭,৭৫৮ কোটি টাকা থেকে কমে হয়েছে ২২,০০০ কোটি টাকা। মিড ডে মিল প্রকল্পে ১৩,২১৫ কোটি টাকা থেকে ৯,২৩৬ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে ৫০০০ কোটি থেকে অনুদান কমে হয়েছে ৩,৫৬৫ কোটি টাকা। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার উদ্দেশ্যে অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলি কোন প্রকল্প কতটা জরুরি তা বিচার করে গুরুত্ব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অনুদান খরচ করতে পারবে।

কিন্তু এই নমনীয়তার একটা উল্টোদিকও আছে। অনেকে মনে করছেন কোনো কোনো রাজ্য নারী এবং শিশুকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলিকে তত গুরুত্ব নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। তবে কী থেকে কী হবে সেটা সময়ই বলতে পারে।

একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় শিশু যৌনতাসূচককে মাথায় রেখে শিশুকন্যাদের জন্য এত ভালো প্রকল্প ভারতে আগে কখনও হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনা এবং উদ্যোগ প্রকল্পটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ণে শিক্ষার ভূমিকা শুধুমাত্র কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে পালন করা যাবে না। এ কথা প্রধানমন্ত্রী জানেন। তাই তিনি শিশু যৌনতা সূচক আরও ভালো করার কথা বলেছেন। তার জন্য কয়েকটা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। মাঝপথে মেয়েদের পড়াশোনা ছেড়ে দেবার অন্যতম কারণ আর্থিক দুরবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া।

প্রকল্পের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এইসব প্রান্তিক পরিবারকে আবার সামাজিক বা গোষ্ঠীজীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পটি কেন্দ্রের কিন্তু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্র নির্মাণের দায়বদ্ধতা রাজ্যগুলির। সুতরাং বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পটিকে যদি সফল করে তুলতে হয় তাহলে সামাজিক রাজনৈতিক প্রশাসনিক স্তরে সমস্ত শ্রেণীর দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নচেৎ কিছু হবার নয়।

নারী সুরক্ষায় ‘সবলা’ যোজনা

সবলা প্রকল্পে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা।

বয়ঃসন্ধি জীবনের এমন একটি পর্ব যখন মানুষের শরীর এবং মনে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আসে। দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকাংশে পাল্টে যায়। ভারতে বয়ঃসন্ধি পর্বের (১০-১৯ বছর) মেয়েরা মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ। কিন্তু তাদের উন্নতি মোটেই বলার মতো নয়। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ১৮ বছর বয়েস হবার আগেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়েসি মেয়েদের মধ্যে প্রতি ছ'জনের একজন প্রসব করতে শুরু করে। গ্রামে অল্পবয়েসে মা হওয়ার ঘটনা খুবই সাধারণ। এরা প্রায় প্রত্যেকেই নিরক্ষর। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়েসি মায়েদের প্রসবকালীন মৃত্যুর হার ৪১ শতাংশ। বিদ্যালয় ত্যাগের ঘটনাও মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি।

বস্তুত, মেয়েদের অসময়ে স্কুলত্যাগ, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, অমানবিক পরিবেশে জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি কারণে একটি বহুমুখী রক্ষাকবচের কথা ভাবা হয়েছিল, যার নাম রাজীব গান্ধী স্কিম ফর এমপাওয়ারমেন্ট অব অ্যাডোলোসেন্ট গার্লস— সংক্ষেপে সবলা। প্রাথমিক ভাবে সবলার লক্ষ্য হলো ১১ থেকে ১৮ বছর বয়েসি মেয়েদের আত্মনির্ভর করে তোলা। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিচালনা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের

প্রধান দায়িত্ব ১১-১৪ বছর বয়েসি প্রতিটি স্কুলছুট এবং ১৪-১৮ বছর বয়েসি প্রতিটি মেয়েকে ৬০০ কিলো ক্যালরি পুষ্টিগুণ, ১৮-২০ গ্রাম প্রোটিন এবং অন্যান্য খাদ্যগুণ সমৃদ্ধ খাবার পরিবেশন করা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং বিভিন্ন নাগরিক সমাজের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দলের নাম কিশোরী সমূহ। দলপতিকে বলা হয় কিশোরী সখী। সবলা প্রকল্পে রেজেস্ট্রিকৃত প্রতিটি কিশোরীকে সবলা কার্ড প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে সবলা প্রকল্পের কাজ কেমন হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। ওড়িশায় রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে মেয়েদের তাঁত ও বয়নশিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ওপর। রাজ্যের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা এগিয়ে এসেছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেয়েরা সরকারি অনুদানের সাহায্যে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকেও ছবিটা এরকম। গুজরাটে রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে মমতা-তরুণী প্রকল্পের ওপর। এই প্রকল্পে স্কুলছুট মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। বয়ঃসন্ধি পর্বের মেয়েরা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। সেইজন্য এই প্রকল্পে নিয়মিত কাউন্সেলিঙের ব্যবস্থা আছে। ছ'মাস অন্তর প্রতিটি মেয়ের শারীরিক সুস্থতা যাচাই করা হয় এবং রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকলে রক্তাল্পতার চিকিৎসা করা হয়। ঝাড়খণ্ড সরকার মেয়েদের বৃত্তিগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ব্যাপারে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং স্থানীয় ৩০টি বেসরকারি সংস্থা সহযোগিতা করছে। মেয়ে পাচার এই রাজ্যের একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে প্রধানত জনজাতি সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে স্কুলশিক্ষার প্রচলন ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মোদী সরকার ২০১৬-১৭ বাজেটে বয়ঃসন্ধি পর্বের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রকল্পে ১৭,৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া রয়েছে বিশ্বব্যাঙ্কের অনুদান বাবদ ৪১৫ কোটি টাকা এবং ন্যাশনাল নিউট্রিশন মিশন ও আই সি ডি এস প্রকল্পের ৩০০ কোটি টাকা। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মতো বিরোধী দল-শাসিত রাজ্যগুলিও যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে মেয়েদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো ক্ষেত্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করা যাবে বলে মনে করছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা

নারীর ক্ষমতায়ণে মোদী সরকারের আর একটি অবিস্মরণীয় অবদান হলো প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে সারা ভারতে বিপিএল (দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবার) তালিকাভুক্ত ৫ কোটি মহিলাকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া শহরে রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেশের মধ্যে সব থেকে কম হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী

ওড়িশায় উজালা প্রকল্পের উদ্বোধনে পেট্রলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

প্রকল্পের উদ্বোধন এই শহরে করেছেন। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র পরিবার উপকৃত হলেও, প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মেয়েরা। টাকাপয়সা যাতে নয়ছয় না হয় তার জন্য সিলিন্ডার পিছু সরকারি ভর্তুকি সরাসরি চলে যাবে বাড়ির কর্ত্রীর ব্যক্তিগত জনধন অ্যাকাউন্টে।

এ তো গেল ভর্তুকির কথা। মহিলাদের স্বাস্থ্যও এই প্রকল্পে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানিয়েছিলেন, সারা দেশে কোটি কোটি মহিলার ফুসফুস রান্নার সময় উনুনের ধোঁয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির ভয়াবহতা বোঝাতে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ঘণ্টায় ৪০০টি সিগারেট খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও জানান, প্রকল্পের একেবারে প্রাথমিক খরচ হিসেবে সরকার ২০০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই প্রকল্পে প্রত্যেক বিপিএল পরিবারকে রান্নার গ্যাসের সংযোগ নেওয়ার জন্য সরকার প্রথমে এককালীন ১৬০০ টাকা করে দেবে। ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক জাতিশুমারির ভিত্তিতে এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনার পর তৈরি হয়েছে বিপিএল পরিবারের তালিকা। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ ৮০০০ কোটি টাকা। এই টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা জানলে মোদী সরকারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জগতে বাধ্য। নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ মানুষ (প্রধানত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত) রান্নার গ্যাসে সরকারি ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছেন। তাতে সরকারের ৫০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। এই টাকার পুরোটাই উজালা প্রকল্পে খরচ করা হবে। মোদী সরকার আশা করছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের কোণে কোণে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া, মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং শ্রমের পরিমাণ ও সময়ও কমবে। মনে করা হচ্ছে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ১.৫ কোটি পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে। লক্ষ্য যদিও ৫ কোটি। এই সব পরিবারের বসবাস ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে। এই প্রকল্প সফল হলে ভারতের প্রত্যেক বাড়িতে গ্যাসে রান্না হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনা নানা কারণে মাইলফলক হয়ে ওঠার দাবী করে। প্রথমত এই প্রথম কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রক নারীকল্যাণ এবং নারীর ক্ষমতায়ণের কথা চিন্তা করে একটি প্রকল্প রচনা করল। এর ফলে ভারতের দরিদ্রতম রান্নাঘরগুলিতে রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাবে। ভারত মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশ। ভারতে রান্নার গ্যাসের ব্যবহার এখনও সীমিত। এর আগে কেন্দ্রে যত সরকার এসেছে সবাই শহরে এবং মফস্সলে রান্নার গ্যাসের জোগান দিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। গরিবদের কথা কেউ ভাবেনি। গরিব পরিবারের মেয়েরা উনুনের ধোঁয়ায় চোখের জল ফেলেছেন। নয়তো অল্পবয়েসেই ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে ফুসফুসের অসুখের জন্য। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডবলিউ এইচ ও) সম্প্রতি জানিয়েছে ভারতে কয়লার উনুনে রান্না করার জন্য প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যান। এদের মধ্যে আশি শতাংশই মহিলা। হয় ফুসফুসের অসুখ, নয়তো হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাঁরা। উজালা প্রকল্প এঁদের সকলের রক্ষাকবচ। সত্তর বছরের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত।

নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রগুলিকে মজবুত করার জন্য মোদী সরকার বেশ কয়েকটি প্রকল্প রচনা করেছে। মেয়েদের জন্ম থেকে শুরু করে বৃদ্ধাবস্থা— দীর্ঘজীবনের নানা সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে এইসব প্রকল্পে। সমাধানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে নানান আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়। আজকের ভারত একবিংশ শতকের ভারত। নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ কারণ তিনি একুশ শতকের ভাবনাই ভাবছেন। ভারতকে এগিয়ে দিচ্ছেন বাইশের দিকে।

উজালা প্রকল্পের উদ্দেশ্য মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা।

একটি মহিলা স্বনির্ভরতার কাহিনি

শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ

তখন ২০০৪ সাল। বর্তমানের বহু আলোচিত স্বনির্ভর গ্রুপ-এর কথা বিশেষ কেউই জানত না। সেই সময়ে এক স্বয়ংসেবক নাগপুরে ২০০৩ সালে তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিবিরে স্বনির্ভর গ্রুপের সম্বন্ধে শুনেছিলেন। ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করেন গ্রামের মেয়েদের এই স্বনির্ভরতার শিক্ষা দিতে। তাঁর স্ত্রী আন্তরিক ভালোবাসার তাগিদে প্রতিবেশী গ্রামীণ মহিলাদের প্রায় ৪৬ জনকে একত্রিত করেন ২০০৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ এক বিকালে। তিনি তার স্বপ্নের শরিক হতে মহিলাদের কাছে আবেদন জানান। এবার ওই মহিলারা দিদিকে বিশ্বাস করে এগিয়ে আসেন এবং তৈরি হয় তিনটি স্বনির্ভর গ্রুপ। মা সারদা গ্রুপ, ভগবতী গ্রুপ এবং নিবেদিতা গ্রুপ। প্রতি দলে সদস্যাসংখ্যা ১২-১৩ জন। দিদি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে থাকেন। প্রতি সপ্তাহে ৫ টাকা করে দলের সদস্যদের জমা দিতে বলেন, প্রতি সপ্তাহে একদিন করে দলের বৈঠক করতে শেখান, দলের সাংগঠনিক দিক এবং সদস্যদের প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় করাতে থাকেন। পাশাপাশি চলতে থাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করার জন্য প্রশাসনের কাছে দৌড়াদৌড়ি। নিজের পকেটের টাকা খরচ করে একাধিকবার বিডিও এবং ব্যাঙ্ক ম্যানেজারদের বোঝাতে সক্ষম হন ওই মহিলাদের উদ্যোগের কথা। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা ফলবতী হয়। ২০০৪ সালের জুন মাস নাগাদ বিডিও (গাইঘাটা)-র লেখা চিঠি পেয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার (ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ঘাঁটুরা) তিনটি গ্রুপের অ্যাকাউন্ট করে দেন। এরপর দিদির চেষ্টায় মহিলারা একে একে ব্যাঙ্কের লেনদেন করতে শেখে। জামদানি গ্রামের বাসিন্দা এই মহিলাদের মধ্যে নিবেদিতা গ্রুপের সদস্যদের ডেকে বিডিও সাহেব স্থানীয় শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে মিড-ডে-মিল রান্নার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন।

নিবেদিতা গ্রুপের সদস্যরা (বাঁ দিক থেকে তৃতীয় দিদি)।

ইতিমধ্যে মা সারদা গ্রুপ ২০০৫ সালে ভেঙে যায়। ভগবতী গ্রুপও কিছু রাজনৈতিক টানা-পোড়েনে দিদির সংশ্রব ত্যাগ করে এবং ভেঙে যায়। নতুন নামে সরকারি সহায়তায় তারা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু নিবেদিতা গ্রুপের সদস্যরা দিদিকে ত্যাগ করেনি। দিদি তাদের বলেছিলেন গ্রুপের টাকা নিজেদের সদস্যদের মধ্যে শতকরা মাসিক ২ টাকা সুদে লেনদেন করে নিজেদের সংসারে সাহায্য করো কিন্তু সরকারি ঋণের প্রলোভনে পড়ো না। ঋণ যেখান থেকেই নেওয়া হোক সেটা ঋণই হয়। গ্রুপের বোনেরা যখনই সমস্যায় পড়েছে দিদির কাছে বারবার পরামর্শ নিয়েছে। নিজেদের দলের অনেক সমস্যার কথা তারা দিদিকে বলেছে। দিদিও ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে তাদের কথা শুনেছেন। যে পরামর্শ দিয়েছেন তারা মেনে নিয়েছে। এভাবেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। যথাসময়ে দলের সরকারি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে (ইছাপুর ২নং ব্লক)। সরকার থেকে মাছ চাষ প্রকল্পের অধীনে গ্রামের পুকুর নিয়ে ওই সদস্যরা (২০১৪-১৫) মাছ চাষ করেছে। ধীরে ধীরে দলের (গ্রুপ) আর্থিক সহযোগিতায় তাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, স্বামীরা ব্যবসা এবং ছোটখাটো কাজ করতে পেরেছে। বসবাস করার ঘরগুলি ভাল হয়েছে। মেয়ের বিয়ে থেকে শুরু করে নানান কাজে দলের (গ্রুপ) টাকা তাদের অন্যতম বড় সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দলের মোট টাকার পরিমাণ (মাসিক জমা দেওয়া কিস্তি ৫০ টাকা, ঋণ নেওয়া বাবদ সুদের পরিমাণ) প্রায় ১৫০০০০ টাকা। এগিয়ে চলেছে নিবেদিতা গ্রুপ।

ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে (২৮ অক্টোবর, ২০১৬) দিদি ওই গ্রুপের সদস্যদের সংবর্ধনা দেন। ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিশিষ্টা মহিলাদের উপস্থিতিতে নিবেদিতা গ্রুপের সদস্যাদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিবেদিতার জীবনী এবং মিষ্টি। ওই দিন সকল সদস্যা এবং উপস্থিত বিশিষ্টা মহিলারা মোট ১৫ জন নিবেদিতার ছবিতে পুষ্পদান করে অঙ্গীকার করেন এই মহীয়সীর জন্ম সার্ধশতবর্ষে তাদের কাজ হবে সাধ্যমতো শ্রম এবং সময় দান করে তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করার কাজে সাহায্য করা। ওই দিনের অনুষ্ঠানে তিনটি বিষয়ে এক বছর ধরে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। (১) ১৮ বৎসরের কমবয়সি মেয়ের বিবাহ দেব না। (২) মেয়েদের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত শিক্ষা নিতে সহযোগিতা করব। (৩) বাল্যবিবাহ হয়েছিল এমন পূর্ণবয়স্কা নানা সমস্যায় জর্জরিত মহিলাদের যথাসাধ্য স্বাস্থ্য এবং আইনগত সাহায্য দিতে দলগত ভাবে চেষ্টা করব।

দিদির বক্তব্য, মেয়েরা তাদের ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে এটাই বড়ো কথা। তবে এখনো অনেক কাজ বাকি। প্রত্যন্ত এলাকার মেয়েদের জাগাতে আরও বহু দিদিকে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের ক্ষমতায়ণে বহু প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

(লেখিকা একজন সমাজ সেবিকা)

ব্ল্যাকমানি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

যে-কোনো দেশের উন্নয়ন এবং ধ্বংস দুটোরই প্রধান কারণ হলো অর্থ। ভারতবর্ষের মতো বিশাল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করার জন্য বেশ কয়েক দশক ধরে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত শত্রুরা চক্রান্ত করে চলেছে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা হলো, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর পুঁজিপতি অসৎ ব্যবসায়ী ও রাজনীতির কারবারিরা বিপুল হারে কালো টাকা (বেহিসেবি অর্থ) গচ্ছিত রাখার কারণে খোলা বাজারের জিনিসপত্রের বিপুলহারে মূল্যবৃদ্ধি হয়ে চলেছে। এতে সাধারণ মানুষের হয়েছে ওষ্ঠাগত প্রাণ। অন্যদিকে ওই কালো টাকা দিয়ে সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক ও প্রশাসনের উপর আঘাত হানার মাধ্যমে চক্রান্তকারীরা রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আবার দেশের অভ্যন্তরে যুবসমাজকে রাজনীতির কারবারিরা এই কালো টাকা দিয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে।

বহিরাগত সমস্যা হলো, ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে সন্ত্রাসবাদী হামলা, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা জাল করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে, দেশের অর্থনীতি পরিকাঠামো ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়ার চক্রান্ত। দেশের এই সঙ্কটেও কিছু অসাধু রাজনীতি কারবারি ও ব্যবসায়ীরা ফায়দা লুঠতে ব্যস্ত।

এই চরম অব্যবস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে, আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে এবং বেনামি সম্পত্তির হিসেব নিয়ে কালো টাকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছেন। আর এতেই এক ঢিলে অনেক পাখি কুপোকাত। সীমান্তে

সন্ত্রাসবাদীরা হয়েছে জব্দ। দেশের মধ্যে কালোটাকার ধনকুবের রাজনৈতিক নেতারা ও অসৎ ব্যবসায়ীরা পড়েছেন ফাঁদে। আর সাধারণ নাগরিকরা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়েও ভারতকে ভবিষ্যতে বৈভবশালী করার লক্ষ্যে এই মহাযজ্ঞে শামিল হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কালোটাকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

—শুভেন্দু সরকার,
মুন্সীরহাট, জে. বি. পুর, হাওড়া।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

যে সকল পর্ষদ কোরানের নির্দেশ পালন করে না এবং অন্যকেও পালন করতে কুযুক্তি উত্থাপন করে ঘৃণ্য ভাবে বাধার সৃষ্টি করে— তাদের দখল ইসলাম ধর্মে থাকতে পারে না। সর্ব প্রথম কোরান ঘোষণা করেছে এরূপ— 'এবং তোমার যা অবতীর্ণ হয়েছে (কোরান) ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে (বেদ, গীতা, তওয়াৎ, গস্‌পেল) তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে বিশ্বাস করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। সূরা— বকোয়া (২) আয়াত নম্বর ৪, ৫ দেখুন।

মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড গঠন হয়েছে ব্রিটিশ আমলে, দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা বাদশাহী আমলের সত্য ও সঠিক মাদ্রাসা ধ্বংস করে এবং ধর্মপ্রাণ-জ্ঞানী মুসলমান পুরুষদের হত্যা করে। সুতরাং ব্রিটিশের দালাল মাদ্রাসা পণ্ডিত এবং ল' বোর্ড-এর পরিচালকের সঙ্গে সত্য-সঠিক ইসলামি শিক্ষা ও আইন কানুনের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব মাদ্রাসা ও মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সঙ্গে পবিত্র কোরান ও পূর্ববর্তী অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ এবং ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই। তাদের পৃথক করে দিতে হবে। তারা কু-কর্ম, কু-ধর্ম, অন্যায়-অবিচার করার জন্য ভারতের সংবিধান সম্মত মৌলিক অধিকারের কাসুন্দি পাঠ করছে। ভারতের শতকরা ৯৭ শতাংশ মুসলমান নর-নারী এবং ৯৯ শতাংশ হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় কুসংস্কারপূর্ণ তিন তালাক, হালালাহ্ (ষড়যন্ত্র করে ধর্ষণ) এবং এক হালি স্ত্রী না রাখার পক্ষে সায় দিচ্ছেন। সুতরাং দুই-তিন শতাংশ ব্রিটিশের দালাল মাদ্রাসা পণ্ডিত ও ল' বোর্ডকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং যে সকল মুসলমান নর-নারী তিন তালাক হালালাহ ও বহু বিবাহের পক্ষপাতী নহেন এবং আদালতের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়েন, তাদের জন্য মহামান্য আদালতের কাছে ন্যায় বিচারের জন্য আবেদন করছি। মাদ্রাসা ও ল' বোর্ডকে সম্পূর্ণভাবে অন্য এক সম্প্রদায় ঘোষণা করতে হবে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও বহুবিবাহের সমর্থক— ল' বোর্ড কেন তাদের জন্য চোরের শাস্তি হস্তকর্তন ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, খুনের শাস্তি মৃত্যু দণ্ড— কার্যকরী করার দাবি করে না? কেন ধর্ম গেল গেল বলে আওয়াজ উঠায় না?

—ফাতিমাতুজ জহরা,
শিলচর, অসম।

হিন্দুদের ভবিষ্যৎ

সেদিন কার্তিক পূজা উপলক্ষে জনৈক ব্যক্তি চাঁদা চাইতে এক দোকানদারকে বলেন, আর পুজোটুজো করা যাবে না, কারণ ছেলে কোথায়। তখন দোকানদার বললেন, সত্যই তো আজ ছেলের বড় অভাব। প্রত্যেকের ঘরে একটি সন্তান— হয়তো মেয়ে, ব্যস আর সন্তান নেই। এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, মা বাবা আর সন্তান। সবাই ছেলেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি করার জন্য ছুটছে, তাহলে বেসিক কাজগুলো করবে কে? কয়জন বাবা মা ছেলেকে মন থেকে মিলিটারিতে পাঠাতে চায়? এটা একটা প্রজন্মের সমস্যা। তাহলে এই শ্রমনির্ভর কাজগুলি কে করবে, হ্যাঁ আমি তথাকথিত ভদ্র স্বচ্ছল হিন্দু সমাজের কথা

বলছি। অপরপক্ষে মুসলমান সমাজে দেখুন এক সন্তানের পিতামাতা প্রায় কেউ খুঁজে পাবে না, খুব অল্পসংখ্যক পরিবারে দুটি সন্তান, দুটির অধিক সন্তান অধিকাংশ পরিবারে। তাদের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য হলো আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হব। না হলে শাহরুখ খান তৃতীয় সন্তান দত্তক নেয়? আমির খান সন্তান সন্ততি থাকা সত্ত্বেও কিরণ রাওকে বিয়ে করে আবার সন্তান 'আডপ্ট' করে? সইফ আলি খান অমৃতা সিংকে বিয়ে করে দুটি মুসলমান সন্তান জন্মদেওয়ার পর আবার অমুসলমান হিন্দু পরিবারের করিনা কাপুরকে বিয়ে করে? আর হিন্দুমেয়েদেরও ধিক, তারা নিজের সমাজের মতো ওদিকে ভেবে ভুল করে পরে অনুতপ্ত হয়, তখন আর কিছু করার থাকে না, তখন চেষ্টা করে অন্য মেয়েদের তার পথে আনতে। এরা তো শিক্ষিত মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তি, এদের মধ্যে তো অশিক্ষা কুসংস্কার নেই। আমি তাঁদের কথা বলছি যাঁরা বলেন যে কুশিক্ষা নিরক্ষরতা অজ্ঞতা অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য মুসলমান সমাজ পিছিয়ে আছে। অপরপক্ষে হিন্দুদের দেখুন তাঁরা অর্থ নাম যশের পিছনে ছুটে চলেছেন যেটা ছোটো পরিবার থাকার জন্য সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু কার জন্য তিনি কষ্ট করছেন, এসব ছেলেরা স্বভাবতঃই বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাকে দেখবে না। বৃদ্ধবয়সে একা নিসঃঙ্গ, বৃদ্ধাশ্রমে আয়া কাজের লোকের উপর নির্ভর করে দিন কাটাতে হবে।

আর এই সমস্ত অ্যাসেট তথা বাড়ি ভোগে আসবে না, এ রকম চললে এই সম্পত্তি বা বাড়ি মুসলমানরা দখল করবে। আজ বাংলাদেশের হিন্দুদের বাড়ি, সম্পত্তি কে ভোগ করছে? কেন ভোগ করছে? কেননা ওদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাধীনতার জন্য সে দেশের হিন্দুরা কম ত্যাগ কষ্ট প্রাণ বিসর্জন দেয়নি বরং হিন্দুরাই বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। তবু তাদের বা তাদের উত্তরপুরুষদের সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এদেশে রিফিউজি হয়ে চলে আসতে হয়েছিল বা এখনো চলে আসতে হচ্ছে। তাই এই পশ্চিমবঙ্গের অ-মুসলমানদের বিশেষ করে হিন্দুদের হুঁশিয়ার করছি এখনো সাবধান হোন। নিজেদের সেকুলারবাদী বলে কালিদাস হবেন না, 'একটি সন্তান' নীতি ত্যাগ করে অন্ততঃ দুটি সন্তান গ্রহণ করুন। একটি যেন অবশ্যই পুত্র সন্তান হয়। আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা সহবাস করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুত্র সন্তানের জন্ম দিত, পৌরাণিক কাহিনিতেও তাই দেখি। পুত্র সন্তান হওয়ার জন্য কিছু নিষ্ঠা, মানসিক ও ধর্মীয় ব্যাপার আছে। কয়জন আর এযুগে সন্তান গ্রহণ করার জন্য সহবাস করে। আজকের দিনে পুত্র বা কন্যার জন্ম তো একটা অ্যাকসিডেন্ট বা যৌন ক্ষুধা নিবারণের ফল।

আর এই বিষফলের জন্য আমরা অসামাজিক সন্তানের জন্ম দিচ্ছি। আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকলে কী হয় ইসলামিক দেশগুলিকে দেখে বুঝতে পারছি। তাই হিন্দুদের বলছি, যদি মানবতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনচিন্তার মতবাদ বজায় রাখতে চান এক সন্তানের নীতি পরিত্যাগ করুন, সমাজ বা দেশের কথা চিন্তা করুন। সুদূর আফগানিস্থান থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত যে হিন্দু রাজ্য ছিল তা কমতে কমতে খণ্ডিত ভারতে দাঁড়িয়েছে। এটাও হারাবেন আগামীদিনে যদি এখনও সাবধান না হোন, সমাজ সচেতন না হোন।

—কমল মুখার্জী,
চুঁচুড়া।

কংসপিতা উগ্রসেন

কম বেশি সকলেই জানেন— মথুরার রাজা কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর নিজে মথুরার রাজা হয়েছিলেন। কংসের ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে পুনরায় উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

স্বস্তিকা ২৯ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায় 'নবাঙ্কুর' বিভাগে 'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে— কংস তার পিতাকে হত্যা করে নিজে রাজা হয়েছিলেন। ওই প্রবন্ধেরই শেষ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মামা কংসকে বধ করে উগ্রসেনকে মথুরার রাজ সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সকলেই একজন উগ্রসেনের কথা জানি। কংস যদি পিতা উগ্রসেনকে বধ করে থাকেন তবে, শ্রীকৃষ্ণ কোন উগ্রসেনকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন? লেখাটিতে ভুল তথ্য আছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্বস্তিকা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় অজিত বারিক মহাশয়ের লেখা--- 'কৃষক-দেবতা ভগবান বলরাম'-এ উল্লেখ আছে পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে কংস নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। দু'জনের লেখায় দু'রকমের তথ্য। বারিক মহাশয়ের তথ্যটিই সঠিক।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি, কোচবিহার।

অভিনন্দন

শারদীয়া স্বস্তিকা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। অভিনন্দন জানাই। দীপাবলী সংখ্যা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ভালো লেগেছে ২১ কার্তিক সংখ্যার জগদ্ধাত্রী পূজা বিষয়ক লেখাগুলিও। প্রতি সংখ্যাই প্রায় বিশেষ সংখ্যা। প্রত্যেকটি রচনাই অনেক পরিশ্রমের ফসল। সুন্দর মৌলিকের দুঃসাহসিক লেখার তারিফ না করে পারা যায় না।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতিকপি ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

গ্রাহক হোন,
গ্রাহক করুন।

বাংলার লক্ষ্মীবাঈ রানি ভবশঙ্করী

মানস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা সকলেই ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই 'বাংলার লক্ষ্মীবাঈ'য়ের কথা কেউ জানি না। ঝাঁসির রানি লড়াই করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। এই বাংলার লক্ষ্মীবাঈ লড়াই করেছিলেন মুসলমানের বিরুদ্ধে, বিদেশি পাঠান-মুসলমানের বিরুদ্ধে। সে ইতিহাস এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ১৫৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। দিল্লীর মসনদে তখন মুঘল সম্রাট আকবর। এই বাংলায় চলছে মুঘল-মুসলমান আর পাঠান-মুসলমানের লড়াই। সে লড়াই ছিল মূলত বাংলা দখলের লড়াই। এই বাংলার ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের রাজত্ব কেড়ে নেবার লড়াই।

সেই সময় এই বাংলা ছিল বহু পরগনায় বিভক্ত। তেমনই এক পরগনার নাম ছিল ভূরশুট পরগনা। রাজধানী ছিল বর্তমান হাওড়া জেলার 'গড়ভবানীপুর' গ্রাম। সেই সময়ে এই ভূরশুট পরগনা বা রাজ্যের রাজা ছিলেন রুদ্রনারায়ণ। তিনি ছিলেন এক হিন্দু ধর্মনিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজা। ভূরশুট ছিল এক হিন্দু রাজত্ব। বর্তমান সমগ্র হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের বেশ কিছু অংশ নিয়ে অবস্থিত ছিল এই হিন্দু রাজত্ব। এই রাজ্যের মজবুত প্রতিরক্ষার জন্য বৃত্তাকার সীমান্তে অনেক দুর্গ গড়ে তোলা হয়েছিল। যে দুর্গগুলিতে বহু সৈন্যসামন্ত মজুত থাকত। রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রথমা স্ত্রীর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি রাজবংশ রক্ষার্থে রাজাকে দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রাজা সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। একদিন রাজা তাঁর রাজত্ব এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দামোদরের শাখা রোন নদীর বুকে নৌকাবিহারে শিবপূজা দিতে যাচ্ছিলেন কাট্‌শাঁকড়া (বর্তমানে কাষ্ঠশাকড়া) গ্রামে। এমন সময় দেখতে পেলেন রোন নদীর গহন অরণ্যতটে একাকিনী এক অপরূপা সুন্দরী যুবতী বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বেরিয়েছেন। তিনি এক হরিণ লক্ষ্য করে, হাতের বর্শা তাক করে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন। হঠাৎ দুটো বুনো মহিষ তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালো। তিনি ভীত না হয়ে বর্শা ছুঁড়ে একটি মহিষকে ভূলুণ্ঠিত করলেন। অন্যটি প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে রাজা রুদ্রনারায়ণ মুগ্ধ হলেন। মনে মনে স্থির করলেন, তাঁর হিন্দু রাজত্ব রক্ষায় এমনই এক বীরাঙ্গনা নারীকে জীবনসঙ্গিনী করা প্রয়োজন। তিনি নদীতটে নৌকা ভিড়িয়ে যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। জানতে পারলেন, যুবতী তাঁরই রাজত্বের অন্তর্গত পেঁড়ো (হাওড়া জেলার মুন্সীরহাটের কাছে) গ্রামের বাসিন্দা দীননাথ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা। তাঁর পিতা দীননাথ দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, অশ্বারোহী, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সুনিপুণ এক সৈনিক। তাঁর স্ত্রী এই বীরাঙ্গনা কন্যা ভবশঙ্করী ও একমাত্র শিশু পুত্রকে রেখে, পরলোকগমন করেছেন। দীননাথ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেননি। তিনি শিশুপুত্রটিকে এক বিশ্বস্ত দাসীর হাতে সমর্পণ করে এই কন্যা সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে দিনযাপন করছেন। শিশুকাল থেকে এই কন্যা পিতার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন পাকা ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠেছে। পিতার কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি ও সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করে উচ্চশিক্ষিতা হয়ে উঠেছে।

রাজা রুদ্রনারায়ণ একদিন দূত মারফত দীননাথ চৌধুরীর কাছে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু কন্যা ভবশঙ্করী বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, 'ভগবান শিবের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে পুরুষ তাঁকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করবে তাকেই তিনি বরমাল্য দেবেন। নয়তো সারাজীবন ভগবান শিবকে স্বামীজ্ঞানে ভজনা করবেন'। দীননাথ বললেন, 'এ কী করে সম্ভব? তোর যে স্বামী হবে তাঁকে তুই এভাবে অপমান করবি? না না এ হতে পারে না'। অনেক বোঝানোর পর ভবশঙ্করী বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বিবাহে রাজি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। তুমি রাজাকে বলো ওই রাজবংশের (রাজবোলহাটে) প্রতিষ্ঠিত মা রাজবল্লভী মাতার পূজার আয়োজন করতে। সেই পূজার শেষে দুটি মহিষ রাখা হবে। একদিকে

থাকবে রাজা আর এক দিকে আমি। আমার সঙ্গে একই সময়ে অস্ত্রচালনা করে রাজাকে এক কোপে মহিষ বলি দিতে হবে। তবেই সেদিন আমি রাজার গলায় বরমাল্য দেব।' ভবশঙ্করী দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় পাটের শাড়ি পরে, গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে, সময়মতো ঘোড়ায় চড়ে এসে রাজবল্লভী মায়ের পূজা দিলেন। রাজার সঙ্গে একই সঙ্গে মহিষ বলি দিলেন। রাজা বলির রক্ত দিয়ে নিজের এবং ভবশঙ্করীর ললাটে তিলক এঁকে দিলেন। ভবশঙ্করী তাঁর গলার পুষ্পমালা খুলে রাজার গলায় পরিয়ে দিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে গেলেন। পরে কোনো একদিন তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হলো। ভবশঙ্করী হলেন রাজরানি। রাজকার্য, সৈন্যদের অস্ত্রশিক্ষা, সীমান্তের প্রতিরক্ষা, সমস্ত বিষয়ে তিনি স্বামীকে সাহায্য করতে লাগলেন। দিন যায়, মাস যায়, বছর পরে একদিন ভূরশুটের রাজধানী গড় ভবানীপুর রাজপ্রাসাদে আনন্দের তুফান উঠলো। রানি ভবশঙ্করী এক অপরূপ সুন্দর শিশুপুত্রের জন্ম দিলেন। নাম রাখা হলো প্রতাপনারায়ণ। আনন্দে আত্মহারা রাজা রুদ্রনারায়ণ রাজকার্যের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর মৃত্যু ঘটল।

রাজার মৃত্যুসংবাদে রাজ্যের সকল প্রজা শোকে মুহ্যমান। রাজপুত্র এখন শিশু। শূন্য রাজ-সিংহাসন পূর্ণ করবে কে? মন্ত্রী, আমলা, রাজকর্মচারী সকলেই চিন্তিত। রানি ভবশঙ্করী শোকাহত। রাজগুরু হরিদেবের সান্ত্বনা ও প্রেরণায় রানি শোক কাটিয়ে এগিয়ে এসে অভয় দিলেন। বললেন, 'ভয় নেই আমি এখনও জীবিত। যতদিন না আমার পুত্র উপযুক্ত হচ্ছে ততদিন আমিই রাজার কর্তব্য পালন করবো। রাজ্যের সকল প্রজাকে ঢ্যাঁড়া দিয়ে জানিয়ে দাও। আমার অভিষেকের ব্যবস্থা করো।' বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীর কথা শুনে উপস্থিত সকল প্রজা রানিমার জয়ধ্বনি করে উঠলো। দিনক্ষণ, পাঁজিপুঁথি দেখে একদিন অভিষেক হয়ে গেল। ভবশঙ্করী হলেন ভূরশুট রাজ্যের শাসনকর্ত্রী।

ঠিক সেই সময় ওড়িশার পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ এই বাংলার হিন্দু রাজাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তাঁদের রাজত্ব হস্তগত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। ভূরশুট-রাজ রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু এবং রানি ভবশঙ্করীর রাজ-সিংহাসন লাভের সংবাদ তার কানে পৌঁছল। দুর্ধর্ষ পাঠান সর্দার ওসমান মনে মনে ভূরশুট রাজ্য দখল এবং রানি ভবশঙ্করীকে তার শয্যাসঙ্গিনী করার উন্মত্ত বাসনা পোষণ করতে লাগল।

অপর দিকে রানি ভবশঙ্করী সিংহাসনে বসেই অল্পদিনের মধ্যে এক সুসংগঠিত অশ্বারোহী, অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সুনিপুণ মহিলা যোদ্ধাবাহিনী তৈরি করলেন। সেই বাহিনীতে ২৫০ জন মহিলা সৈন্য সবসময় মজুত থাকত। তাদের মধ্যে আবার বিশেষ দশ জনের এক বাহিনী সবসময় রানিমার প্রহরায় থাকতেন। নারীবাহিনী ছাড়াও তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও সেনাবাহিনীকে যথেষ্ট মজবুত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে সকল প্রজার মঙ্গলসাধনেও নজর দিলেন। প্রজাকল্যাণের জন্য সকলে তাঁকে মাতৃজ্ঞানে দেখতে লাগল।

সেই সময় রানিমা মাঝে-মধ্যেই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের কাছাকাছি কাটশাঁকড়া গ্রামের শিবমন্দিরে দু-একদিনের জন্য অবস্থান করতেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারা দিতেন এবং অতিথিনারায়ণ সেবা করতেন। ওই মন্দিরে অবস্থান কালে একদিন এক গুপ্তচর এসে রানিমাকে খবর দিলেন পার্শ্ববর্তী কয়েক মাইল দূরে আমতা গ্রামে, ২০-৩০ জন পাঠান সৈন্যের একটি দল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে জড়ো হয়েছে। সেই দলে স্বয়ং পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ-ও বর্তমান। তারা বলাকওয়া করছে তারা রানিমার দেওয়া ভাণ্ডারা খেতে আসবেন। বুদ্ধিমতী ভবশঙ্করীর বুঝতে দেরি হলো না, ওসমান খাঁ-র আসল উদ্দেশ্য কী? তারা চায় রানি ভবশঙ্করীকে বন্দি করে নিয়ে যেতে। রানিও হুঙ্কার ছেড়ে তাঁর প্রমীলা বাহিনীকে বললেন, 'তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। দেখি আজ বাংলার বাঘিনীকে কেমন করে বন্দি করে ওই কাপুরুষ পাঠান সৈন্যের দল'।

রানির কথামতো শিবমন্দিরকে মধ্যবিন্দু করে চারিদিক থেকে এমন ভাবে সৈন্য স্থাপন করা হলো যেন একটা চক্রব্যূহ তৈরি হয়। নারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ এবং পুরুষ সৈন্যের ছোট একটি দল নারীর সাজে সজ্জিত দশ-বারো জনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে দূরে দূরে জঙ্গলে প্রবেশ করল। তাঁদের হাতে ছিল ধারালো তলোয়ার আর একটি করে বড় ঢাল। যে ঢাল দিয়ে সমগ্র শরীর ঢেকে মাটিতে শুয়ে থাকলে বোঝা যেত না তার মধ্যে কোনো মানুষ আছে। শত্রুপক্ষ কাছে এলে চকিতে লাফিয়ে তাকে ঘায়েল করা যেত। অপরূপা সুন্দরী ভবশঙ্করী শিবমন্দিরে প্রবেশ করে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পশ্চিমাকাশে সূর্যদেব অস্তমিত, পাখিরা কলরব করে কুলায় ফিরতে ব্যস্ত। এমন সময় তলোয়ারের ঝনঝনানি শব্দে ভবশঙ্করীর ধ্যানভঙ্গ হলো। তিনি নিজের কৃপাণ কোষমুক্ত করে মন্দিরের বাইরে এসে দেখলেন সুবিস্তৃত আমবাগানের মধ্যে মন্দিরের চারিদিকে পাঠান সৈন্যরা ভূলুণ্ঠিত। তাঁর বীরাঙ্গনা প্রমীলা বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনিও স্থির থাকতে পারলেন না। নিজ-হস্তে কয়েকজন পাঠান সৈন্যকে ভবপারে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ দেখলেন শিবমন্দির সংলগ্ন একটি মোটা গাছের আড়াল থেকে স্বয়ং পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছে। তাঁর ইচ্ছা এখনই রানি ভবশঙ্করীকে তুলে নিয়ে যায়। রানি তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তলোয়ার উঁচিয়ে তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন। বীরপুঙ্গব, নারী-লোলুপ ওসমান খাঁ রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়ে নৌকাযোগে দামোদর নদী পেরিয়ে কোনো ক্রমে সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচলো। রানি কাটশাঁকড়ার শিবমন্দির ছেড়ে আবার বেশ কিছুদিন রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করতে লাগলেন। ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতে লাগলেন। রাজ্যের সকল প্রজা রানিমা বলতে অজ্ঞান।

বেশ দিন কাটছিল। রানিমার একদিন ইচ্ছে হলো তিনি তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ছাউনাপুর দুর্গে কয়েকদিন

অবস্থান করবেন এবং সেখান থেকে দুই-এক ক্রোশ দূরে বর্তমান হুগলী জেলার বাসুড়ী গ্রামে তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দিরে একদিন তন্ত্রমতে 'মা ভবানী'র পূজা দেবেন। কথামতো সমস্ত ব্যবস্থা হলো।

সেদিন ছিল এক বৈশাখী অমাবস্যার রাত। বাসুড়ী গ্রামে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। দূর থেকে শুধু শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। রানি ভবশঙ্করী রাজগুরুর উপস্থিতিতে এবং নির্দেশমতো তন্ত্র সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। বাইরের জগতে তাঁর মন নেই। মন্দিরের বাইরের প্রান্তরে তাঁর প্রমীলা বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তা বেশ কয়েকজন দেহরক্ষিণী মুক্ত কৃপাণ হাতে নিঃশব্দে ঘোরা ফেরা করছেন। এমন সময় এক ঘোড়সওয়ার গুপ্তচর সৈনিক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রানিমার দেহরক্ষিণীগণ তাঁকে ঘিরে রানিমার কাছে নিয়ে গেলেন। রানি সাধনা ছেড়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সেই সৈনিক একটি পত্র বের করে রানিমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই পত্র পেঁড়োগড়ের অধিপতি ভূপতিকৃষ্ণ পাঠিয়েছেন। ভূরশুট রাজ্যের সামনে এখন এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত।'

রানিমা প্রদীপের আলোয় সেই পত্র পাঠ করে জানতে পারলেন, তাঁর প্রধান সেনাপতি চতুর্ভুজ এক ভয়ঙ্কর বেইমানিতে লিপ্ত হয়েছে সে পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ-র সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছে। ভূরশুট রাজ্যের রাজা হবার লোভে সে ওসমানকে কথা দিয়েছে, ছলে বলে কৌশলে রানি ভবশঙ্করীকে তাঁর হাতে তুলে দেবে। বিনিময়ে ওসমান খাঁ তাঁকে ভূরশুটের রাজা করবে।

পত্রে আরো জানতে পারলেন তাদের সেই গোপন চুক্তি মতো ওসমানের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশো পাঠান সৈন্যের এক অশ্বারোহী বাহিনী গোপনে রাতের আঁধারে ভূরশুট রাজ্যের দিকে এগিয়ে আসছে। দিনের আলোয় তারা কোনো জঙ্গলে অবস্থান করছে, আর রাতের আঁধারে এগিয়ে আসছে। সেই মতো বর্তমান হুগলী জেলার খানাকুল গ্রামের এক জঙ্গলে তাদের অবস্থান করতে দেখা গেছে। কালু চাঁড়াল নামক এক ব্যাধ তাদের দেখতে পেয়ে সেই খবর খানাকুলের কোতোয়ালকে জানিয়েছে। রানিমা পত্রপাঠ সেই গুপ্তচরকে দিয়ে ভূপতিকৃষ্ণকে বলে পাঠালেন চতুর্ভুজকে কারাগারে বন্দি করতে। আর সমস্ত গড়ের অধিপতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। সেই রাতেই রানিমা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অন্যান্য লোক মারফত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

বাসুড়ী গ্রামকে কেন্দ্র করে বহুদূর দিয়ে সৈন্য সমাবেশ করা হলো। বিভিন্ন গড়ের সকল সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হলো। রানির প্রমীলা বাহিনীও যুদ্ধের প্রস্তুত হলো। ভূরশুট রাজ্য পাঠান-মুসলমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জীবন পণ করে সকল হিন্দু ঐক্যবদ্ধভাবে রানি ভবশঙ্করীর পাশে দাঁড়ালেন। সাধারণ হিন্দু প্রজারা দূরে দূরে এমন ভাবে আগুন লাগানোর ব্যবস্থা রাখলেন যে, পাঠান সৈন্যদল কোনো টেরই পাবে না।

পরদিন বিকালে বর্তমান হুগলী জেলার পুরশুড়া গ্রামের কাছে জলশূন্য দামোদর নদী পেরিয়ে ওসমান খাঁর অশ্বারোহী পাঠান যোদ্ধার দল দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে বাসুড়ীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। রানি ভবশঙ্করী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে এক হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর সম্মুখ সমর। দুর্ধর্ষ পাঠান সৈন্যের সঙ্গে বীর-বিক্রমে লড়াই করতে লাগল হিন্দু সৈন্যদল। বিশেষ করে রানি ভবশঙ্করী স্বয়ং অস্ত্রের ঘায়ে বহু পাঠান সৈন্যকে হত্যা করলেন। তাঁর প্রমীলা বাহিনীর বহু সদস্যা দেশরক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করলেন। সন্ধ্যা নামতেই চক্রাকারে আগুন লাগানো হলো। পাঠান সৈন্যের দল হতচকিত হয়ে প্রাণভয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হাতির পিঠ থেকে নেমে স্বয়ং ভবশঙ্করী ওসমান খাঁর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অসিযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ওসমান খাঁর চোখের সামনে যখন একের পর এক পাঠান যোদ্ধা হিন্দু সেনার হাতে প্রাণ দিতে লাগল তখন সে অসহায় দুর্বলের মতো পিছু হটতে লাগল। বিশেষ করে প্রজ্বলিত আগুনের চক্র-শিখায় পুড়ে মরার ভয়ে বেশ কিছু সংখ্যক পাঠান সৈন্য যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে গেল। রানির অস্ত্রের আঘাতে ওসমান খাঁ-র ঘোড়া নিহত হলো। স্বয়ং ওসমান খাঁ রানি ভবশঙ্করীর হাতে প্রাণ যেতে পারে এই আশঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গোপনে ওড়িশায় পালিয়ে গেল। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন হিন্দু রানি বাংলার লক্ষ্মীবাঈ ভবশঙ্করী। চারিদিকে তাঁর জয়যাত্রা ঘোষিত হলো।

তৎকালীন দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে ভূরশুট রাজ্যে প্রেরণ করেছিলেন রানি ভবশঙ্করীকে সম্মান ও স্বীকৃতি জানাবার জন্য। সেদিন ভূরশুটে এক বিরাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানসিংহ রানিকে একটি মানপত্র এবং তলোয়ার প্রদান করে 'রানি রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই থেকে তৎকালীন ভারতে রানির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান হুগলী জেলার বাসুড়ী গ্রামের যে প্রান্তরে ওই যুদ্ধ হয়েছিল আজও সেটি 'রায়বাঘিনীর মাঠ' নামে খ্যাত। রানির প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির আজও বিদ্যমান। বর্তমানে হাওড়া জেলার গড় ভবানীপুর গ্রামে ভূরশুট রাজ্যের সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। সম্রাট আকবর প্রদত্ত সেই তলোয়ার আজও পেঁড়ো গ্রামের এক মন্দিরে রাখা আছে। আক্ষেপ এই— এমন একজন লক্ষ্মীবাঈ-য়ের কথা এই বাংলার নতুন প্রজন্ম কিছুই জানলো না।

তথ্যসূত্র :

(১) রায়বাঘিনী— লেখক বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ও বাণীকুমার।

(২) হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস— বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের

মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ভারতমাতা

রনি চট্টরাজ

ভারতবাসী প্রাচীনকাল থেকে ভূমিকে মা বলে মনে করে। এর থেকেই এসেছে ভারতমাতার ধারণা। ভারত আমাদের মা, তাই সে ভারতমাতা। আমাদের জন্মদাত্রী মা যেমন আমাদের সবার কাছে কত ভালোবাসার, কত আদরের তেমনি ভারতমাতাও। এই ভারত মা আমাদের যেমন মা, তেমনি আমাদের মায়েরও মা। তাই ভারতমাতা সবার চেয়ে বড়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বলেছেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'। মানে জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। কেউ যদি চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভারতের মানচিত্র কল্পনা করে তাহলে সে দেখতে পাবে ভারতের উত্তরে হিমালয় হলো মায়ের মুকুট, দক্ষিণে কন্যাকুমারী হলো মায়ের পা, যেন দুদিকে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বন্দে মাতরম্ গান আমরা সবাই শুনেছি। সেখানে ভারতমাতাকে দশভুজা দুর্গা বলা হয়েছে— 'ত্বাং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই গান তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে আছে। সেই উপন্যাসে দেশকে মা বলা হয়েছে। স্বদেশি যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গমাতার ছবি এঁকেছেন। সেই বঙ্গমাতাই পরে ভারতমাতা রূপে পূজিতা হয়েছেন। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, এই দেশ কেবলমাত্র মাটি নয়, এই দেশ জীবন্ত জাগ্রত। পরে অনেক চিত্রকর অনেকভাবে ভারতমাতার কল্পনা করে তাঁর ছবি এঁকেছেন। তবে সেই চিত্রের

রূপ যেমনই হোক না কেন, তার বাহন সিংহই হোক আর বাঘই হোক সমস্ত ভারতবাসীর কাছে তিনি মা। দেশের একেকটি প্রান্ত সেই মায়ের অঙ্গ। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন বিপ্লবীরা এই দেশকে মাতৃজ্ঞানে তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করার শপথ নিয়েছে। সেজন্য কত কষ্ট সইতে হয়েছে তাঁদের। ইংরেজরা তাঁদেরকে জেলে বন্দি করে কত অত্যাচার করেছে। কিন্তু তবু তাঁরা বলে গেছে 'ভারতমাতা কী জয়'। বিবেকানন্দ হেঁটে হেঁটে সারা ভারত পরিভ্রমণ করার পর বলেছেন, আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হোন ভারতমাতা।

বর্তমানে আমরা যে ভারতের মানচিত্র দেখি সেটি দেশ ভাগ হওয়ার পরে। ১৯৪৭ সালে দেশকে ভাগ করা হয়েছে, ভারতমাতাকে দু'টুকরো করা হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এক সময় ভারতের অংশ ছিল। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এই সব দেশ এক সময় ভারতের অঙ্গ ছিল। আমরা যে জাতীয় সঙ্গীত গাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সঙ্গীত দেশ ভাগ হওয়ার আগে লিখেছেন। তাই সেখানে আছে 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'। কিন্তু এই সঙ্গীতে যে সিন্ধুর কথা বলা হয়েছে সেই সিন্ধু আজ ভারতের মধ্যে নেই। এক সময় সিন্ধু ছিল ভারতমাতার অঙ্গ। ভারতমাতার অঙ্গহানিতে ভারতের প্রকৃত সন্তানরা অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাই ঋষি অরবিন্দ বলেছেন এই দেশ একদিন জোড়া লাগবে, আমাদেরকে তা করতেই হবে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন এমন ছবি ও মূর্তি তৈরি করে আমরা সবাই ভারতমাতার পূজা করি, ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিই। সেই ভারতমাতা আসলে এই দেশের মাটি। তাই স্কুলে যাওয়ার সময়, মাঠে খেলার সময় সব সময় মনে রাখতে হবে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি ভারতমাতার অঙ্গ।

রাজ্য পরিচিতি

অন্ধ্রপ্রদেশ

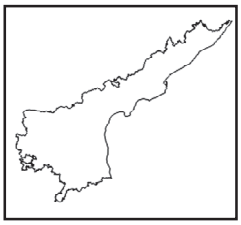

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত অন্ধ্রপ্রদেশ। আয়তনে এটি ভারতের অষ্টম বৃহত্তম রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৯৭২ কিলোমিটার, যা ভারতের দীর্ঘতম উপকূলরেখা। রাজ্যটির রাজধানী হায়দরাবাদ। ভাষা তেলুগু।

প্রাচীনকালে সাতবাহন রাজ্যের রাজারা অন্ধ্রে রাজত্ব করতেন। তাদের রাজধানী ছিল অমরাবতী। এছাড়াও ইক্ষ্বাকু, পল্লব ইত্যাদি রাজবংশ এখানে রাজত্ব করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই সাংস্কৃতিকভাবে এই রাজ্য খুব সমৃদ্ধ। তিরুমালা মন্দির এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এই রাজ্যটি গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীবিধৌত। প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় বলে অন্ধ্রপ্রদেশকে 'ভারতের চালের বাটি' বলা হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২০৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৩৩ জন।

এসো সংস্কৃত শিখি

अहं कथं वदामि ?

আমি কি করে বলব?

तथा भवति किम् ?

তাই হয় কি?

भवत: समय: अस्ति किम् ?

আপনার এখন সময় আছে কি?

अद्य भवत: कार्यक्रम: क: ?

আজ আপনার কি কাজ আছে?

अरै! पादस्य किम् अभवत् ?

আরে, পায়ে কী হয়েছে?

ভালো কথা

গঙ্গা পরিষ্কার

গঙ্গা থেকে আমাদের বাড়ি বেশিদূরে নয়। চারিদিকে যখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলছে তখন আমাদের এখানেও ঠিক হলো আমরা গঙ্গা পরিষ্কার করব। গঙ্গা পরিষ্কার বলতে গঙ্গার পাড় পরিষ্কার। সেই মতো একদিন সবাই মিলে কয়েকজন কাকুর নেতৃত্বে ভুতনাথ মন্দিরের ঘাটে উপস্থিত হলাম। হাতে হাত লাগিয়ে ঘাটের কিছু অংশ পরিষ্কার করা হলো। গঙ্গার দু'পাড়ে প্রতিদিন এত নোংরা জমে যে তা পরিষ্কার করা একদিনের কাজ নয়। তবু মানুষকে সচেতন করার জন্য একবার চেষ্টা করা হলো।

সুহৃদ উপধ্যায়, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

সেদিন ভোরে

সংযুক্তা চন্দ, অষ্টম শ্রেণী

সেদিন ভোরে দেখি উঠে
রঙের মেলা বাগান জুড়ে
ফুল ফুটেছে গাছে গাছে
সুবাসে মন ভরে ওঠে।

ঝলমলিয়ে রোদের গায়ে
হলদে গাঁদা পাপড়ি মেলে
প্রজাপতি যায় উড়িয়ে
রঙিন ডানায় রঙ ছড়িয়ে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

তিন তালাক এবং নিকাহ্ হালাল

অনন্যা চক্রবর্তী

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনোরকম ভালোবাসার সম্পর্ক স্বীকার করে না। প্রেম বলতে সারা বিশ্ব যা বোঝে ইসলামি মজহব তা মনে করে না। তাদের কাছে প্রেম পশ্চিমি ভোগবাদের ফসল। বস্তুত, ইসলামে বিয়ে একটি সামাজিক কর্তব্যমাত্র। মূলত সন্তান উৎপাদনের জন্য যার প্রয়োজন। আজন্ম যে সম্প্রদায় ধর্ম ছাড়া

অন্য কোনো বিষয়কে খুব একটা পাত্তা দেয় না, তারা, বিশেষ করে তাদের পুরুষেরা যদি এরকম একটি মানসিকতা নিয়ে বড়ো হন তাহলে সেই সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন হতে পারে তা সহজেয় অনুমেয়।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ বলেছেন, 'যে সব মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইবে বেহেস্তের দরজা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।' এমন একটি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমান পুরুষের আর কীই বা করার থাকে! সুতরাং পুরুষ চাইলে (মেয়েরা নয়) তিনবার 'তালাক' বলে বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন। তারপর তিনি 'প্রাক্তন' স্ত্রীকে রাস্তায় বের করে দিলেও ধর্ম ও সমাজের কোনো আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়, তিনবার 'তালাক' শোনার সেই মুহূর্তে মহিলাটি তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন এবং তিনি নিজে ও তার সন্তানেরা এই তালাকের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা মাসোহারা পাবেন না।

যদিও এখন মেয়েরাও বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারে। হ্যাঁ, শুধু আবেদনই করতে পারে। কারণ আবেদন করলে সেই মামলা শারিয়া আদালতে দীর্ঘদিন ধরে চলে। ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে আদালত বিচ্ছেদের আবেদন নাকচ করে দেয়। যে সব মহিলা বিচ্ছেদের আবেদন করেন তাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহভাবে বেড়ে যায়। বস্তুত, মুসলমান সমাজে মেয়েদের মূল্য একটি আসবাব কিংবা বাড়ির পোষা ছাগলের থেকে বেশি নয়। পুরুষ চাইলে তাদের প্রতি সদয় হতে পারে, মারধর করতে পারে, নির্বিচারে ধর্ষণ করতে পারে— এমনকী চাইলে খুনও করতে পারে। সমাজ বা আইন কেউ টু-শব্দটি করবে না।

নিকাহ্ হালাল শব্দবন্ধের অর্থ বিবাহিত সম্পর্কের বলি। তিনবার 'তালাক' বললেই তা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো একবার তালাক দেওয়ার কোনো দম্পতির (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষটির) যদি মনোভাবের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তারা যদি আবার একসঙ্গে থাকতে চান তখন কী হবে? এক্ষেত্রে শরিয়া আইন খুবই কড়া এবং অমানবিকও। তালাকপ্রাপ্ত মহিলা যতক্ষণ না অন্য কাউকে বিয়ে করছেন এবং যতক্ষণ না তাদের সন্তানের (শারীরিক সম্পর্কের প্রমাণ) জন্ম হচ্ছে ততক্ষণ

অঙ্গনা

আদালতের পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয় আগের তালাকটি আইনসম্মত ছিল কিনা! মসলমান পুরুষ বিয়ে করে নিজস্ব একটি যৌনদাসীর জন্য। মেয়েদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মুসলমান পুরুষ যে কোনো সময় তাকে ভোগ করতে পারে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, স্বামী কর্তৃক ধর্ষিতা হবার ঘটনা মুসলমান সমাজে সব থেকে বেশি, প্রায় আশি শতাংশ। শরিয়া আইনের প্রবক্তরা বলে থাকেন, মেয়েদের নিরাপত্তা এবং সম্মানের কথা বিবেচনা করেই তিন তালাক এবং নিকাহ্ হালালের মতো প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। তারা আরও বলেন, নিকাহ্ হালাল নাকি আগে থেকে পরিকল্পনা করে করা যায় না। তা সত্ত্বেও যদি কেউ করে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সে শাস্তি যাবজ্জীবন কারাবাসও হতে পারে আবার অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে মেরেও ফেলা যেতে পারে। শিষ্টাচারসম্মত না হলেও সবই আইনসম্মত এবং অবশ্যই ধর্মসম্মত।

শেষ করব আয়েশার কথা বলে। আয়েশার বিয়ে হয়েছিল রইফ-আল কুরেসির সঙ্গে। পরে তাদের দু'জনেরই মনোভাব বদলে যায়। তারা ফিরে আসার কথা ভাবেন। শরিয়ার নিয়ম মেনে বিয়ে করেন আবদুর রহমানকে। রুগ্ন-নপুংসক আবদুর রহমানের সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এই মিথ্যে বিয়ে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আবেদন করেন আয়েশা। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, যতক্ষণ না আয়েশা এবং আবদুর রহমানের শারীরিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের সন্তানের জন্ম হচ্ছে ততক্ষণ আদালতের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। ▮

ইসলামের অস্তিত্বেই সংকট

অতিথি কলম

হাসান সুরুর

ইসলাম প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকের ধর্মযুদ্ধের (crusade —খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রধান্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ) পর এই প্রথম ইসলামের অস্তিত্বই আজ আক্ষরিক বিপন্নতার পথে। কিন্তু বাস্তবে কোনো মুসলমানকেই তেমন চিন্তিতভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করতে শোনা যাচ্ছে না যে ইসলামের ভবিষ্যৎ কী? ইসলাম কি এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারবে? আর যদি পারেই তাহলে কীভাবে?

তবে, আজকের পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রশ্ন তোলাকে হয়তো ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বলে মনে করা বিচিত্র নয়। কিন্তু যাঁরা মনে করছেন আজকের এই সমস্যা নিতান্তই সাময়িক আর (যেমন আমরা crusade-কে পার করে দিয়েছিলাম) ঠিক সেরকমই এটাও সামলে নেব। এমনটা ভাবলে হয়ত সব সময় ঠিক হবে না। চিরকালের সহনশীল হিন্দুধর্ম দিকবিদিকে নানান পন্থায় বিভক্ত ইসলামীয় হিংসার উৎসার হয়ত বরাবর সহ্য করবে না।

এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার— 'ধর্মযুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে আর বাইরের শত্রুর মোকাবিলার সময় খুব সহজেই বিরোধিতা করতে একজোট হওয়া যায়। কিন্তু আজকে বিপদটা আসছে ভেতর থেকেই। মুসলমানরাই আজ ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। আজকের সংঘর্ষ কিন্তু মুসলমান ও অবিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ মুসলমান বা অধার্মিক মুসলমান এমনকী শিয়া-সুন্নির অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আজ লড়াই লেগেছে সুন্নির সঙ্গে সুন্নির, শিয়ার সঙ্গে শিয়ার অর্থাৎ একজন মুসলমানের সঙ্গে আর একজন মুসলমানের।

একটা সময় ছিল যখন এই মুসলমান সম্প্রদায় সারা বিশ্বে তাদের একই ধর্মবিশ্বাসের অধীনে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ বা 'উম্মার' জন্য গর্বিত বোধ করত, আজ মুসলমান বলতে অনেকেই বুঝছেন একটি পরিবারের সঙ্গে হয়ত আর একটি পরিবারের লড়াই। 'জিহাদ' আজ চার দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার আত্মজদেরই সংহার করছে। সারা বিশ্বের মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা আজ নিজেদের টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত করে তীব্র ঘৃণার সংঘাতে লিপ্ত।

ভাবলে হতবাক হতে হবে এখন যে 'হজ' অর্থে পবিত্র তীর্থযাত্রা যেটিকে সর্বার্থে ইসলামিয় সংহতির মূর্ত প্রতীক বলে ধরা হয় সেখানেও ইসলামকে নিয়ে তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। তাই এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এক সময় আমরা সকলেই মুসলমান ছিলাম কিন্তু আজ আর নেই। এখন আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের বিচিত্র সব কামরায় বিভক্ত হয়ে আছি। এই কামরাগুলিকে আলাদা বোঝাতে নানান মার্কা মারা আছে। যেমন দেওবন্দী, বরেলভিস, মালাফিস, ওয়াহাবি, ওয়াহাবি সালাফিস আরও কত কী। এর মধ্যে আবার স্বনিযুক্ত কিছু ধর্মীয় মাতব্বর কাউকে 'ভাল মুসলমান' কাউকে 'খারাপ মুসলমানের' তকমা দিয়ে দিচ্ছে। আর যদি কেউ এই মাতব্বরদের ভাল খারাপের পরীক্ষায় ফেল করে তাহলেই গেল। অর্থাৎ খারাপ মুসলমান ঘোষিত হলেই তার ওপর নেমে আসবে নরকের চেয়ে নারকীয় আঘাত, কেননা মোল্লার আক্রোশ অতি কুৎসিত।

হ্যাঁ, আপনি নিশ্চয় বলতে পারেন বিভাজন তো বরাবরই ছিল। কিন্তু তা ছিল একটি নিশ্চিত ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার গণ্ডির মধ্যে। কাউকে কোনো একজনের মতো বা ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে অমিল হলেই তৎক্ষণাৎ খুন হয়ে যেতে হোত না। শিয়া সুন্নিদের মধ্যে একটা চাপা ধর্মীয় ভাবনার পারস্পরিক বিরোধিতা বরাবরই ছিল কিন্তু সাধারণত মহরমের সময় রাস্তাঘাটের খুচরো মারপিট ছাড়া নৃশংস হিংসার আশ্রয় নিতে তাকে কখনই দেখা যায়নি।

আজ শিয়ারা শুধু শিয়া হওয়ার কারণেই খুন হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সঠিক মুসলমান পদবাচ্য বলেই মানা হয় না। এই ভেদাভেদ এক সময়

আজ শিয়ারা শুধু শিয়া হওয়ার কারণেই খুন হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সঠিক মুসলমান পদবাচ্য বলেই মানা হয় না। এই ভেদাভেদ এক সময় কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বা গবেষকদের আলোচ্য বস্তু ছিল। তাই কখনই তা সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করত না।

কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বা গবেষকদের আলোচ্য বস্তু ছিল। তাই কখনই তা সাধারণ মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করত না। যে ধর্মটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়— যখন এই ধর্মাবলম্বীদের কাউকেই এমনটাই করতে হবে বা এমনটা করা চলবে না এ নিয়ে মতবিরোধ হলে কেউই কারুর মাথায় বন্দুক ধরত না, বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সেই ধর্মমতই এক তীব্র ধর্মীয় আতঙ্কের সৃষ্টি করে কঠিন এক অসহিষ্ণু অনুশাসনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। যার বিচিত্র সব কদাচার দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

চরমপন্থী আত্মনিযুক্ত ধর্মীয় অভিভাবকরা ইসলামকে হাইজ্যাক করেছে। তারা তীক্ষ্ণ নজর রাখছে তাদের দেওয়া ফতোয়া অনুযায়ী কেউ যদি সঠিক মুসলমান বলে প্রতিপন্ন না হয় তার বাঁচার অধিকারও সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভাববেন না যে আমি সিরিয়া বা ইরাক বা লিবিয়ায় কী হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে এ কথা বলছি কিংবা পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ইসলামের নামে কী বিষাক্ত হিংস্র পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে সে প্রসঙ্গ তুলছি। আজ ব্রিটেনের রাস্তাতেও এর ঘৃণ্য পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজকাল 'Not Muslism enough' একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সাইট। এখানে চোখ পাতলেই দেখা যাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অসহিষ্ণুতা কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে। এরই প্রলম্বিত রূপ হিসেবে সম্প্রতি ব্রিটেনে তিনজন মুসলমানকে মুসলমানরাই খুন করেছে যথাযথ মুসলমান না হওয়ার মনগড়া ধারণায়। নিহতদের একজন ছিলেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের, অন্য দু'জন সুন্নি সম্প্রদায়ের। এঁদের মধ্যে সুফি ভাবধারার কিছু অনুশীলন লক্ষ্য করায় 'সালাফি সুন্নিরা' তাঁদের এই জীবনচর্যা অ-ইসলামীয় ধরে নিয়ে এঁদের খুন করেছে। প্রসঙ্গত ব্রিটেনের বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনে মুসলমানদের বসবাস বেশি। এই অঞ্চলে ধর্মীয় অনুশাসন সংরক্ষণকারীরা সদা ভ্রাম্যমান থেকে নজরদারি করছে— মুসলমান মেয়েরা তাদের পোশাক-আশাক সঠিক ইসলামিয় রীতি মেনে পড়ছে কিনা। তাদের এই ব্যক্তি জীবনে অনধিকার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যারা গলা তুলছে তাদের কুৎসিত গ্যালিগালাজের সঙ্গে নিত্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আজ বস্তুপচা সেই স্লোগানটি বাজার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে এই সব কুকর্ম কেবল ইসলামের আত্মাকে বাঁচাতেই ঘটানো হচ্ছে। প্রশ্ন ওঠা উচিত, কোন ইসলাম? আজকের চালু ইসলাম বলতে ভিন্ন ভিন্ন মুসলমানের কাছে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একজন মুসলমান যে ইসলামে আস্থাবান আর একজন তাকে বলছে ওর বিশ্বাস ফালতু। এরই পরিণতিতে ইসলাম আজ এক চরম বিকৃত রুচির ও কেবলমাত্র নিজের নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করার ধর্মে পরিণত হয়েছে।

পরিণতিটা কিন্তু হঠাৎ ঘটেনি। এই বিকৃতির সূচনা গত শতাব্দীর ৭০-৮০ দশকের সময় থেকে। তখনই শুরু হয়েছিল সুন্নি ইসলামিয়দের মধ্যে ওয়াহবিকরণ আর ইরানের আয়াতুল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে খোমাইনিকরণ। এই সূত্রে সলমন রুশদির 'Satanic Verses' গ্রন্থটির নিষিদ্ধ হওয়া ও তাঁর মাথার জন্য ফতোয়া দেওয়া এই প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ঘৃণ্যতার প্রথম প্রশ্রয়। এরপর থেকেই পরিস্থিতি ক্রমশ অধোগামী হয় আর মোল্লাদের আধিপত্য থেকে ক্ষমতা চলে যায় গুণ্ডাদের হাতে। এই পটভূমিতে আবার অবাক লাগে মুসলমানদের এই অসীম উদাসীনতা দেখে। তাদের নিজস্ব উত্তর হচ্ছে সব ধর্মের ক্ষেত্রেই অনেক সময় বিপন্নতা আসে যেমন খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে হয়েছিল। আদতে তা থেকে ধর্ম আরও বলশালী হয়ে বেরিয়ে আসে। তাই ২১ শতকে এক নবীন ইসলামকে দেখা যাবে। কিন্তু এইসব কল্পনার মধ্যে কোনো গ্রহণীয় প্রমাণের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। উল্টে দেখা যাচ্ছে তার ঠিক উল্টো। বিশ্বের নানান প্রান্তে প্রকট হয়ে উঠছে অসহিষ্ণু নির্যাতনকারী, ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ বিচিত্র প্রজাতির হিংস্র ইসলাম। দেখে শুনে এমনটাই মনে হচ্ছে ইসলামের গৃহযুদ্ধ আরও তীব্র হবে। আর সেটা ঘটবে সৌদি আরব অঞ্চলের বিশ্বে সুন্নি আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা বনাম ইরানকে ঘিরে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের তীব্র সংঘাতের প্রসারে। তাই মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার বোঝাটা ক্রমশই বেড়ে চলবে বলে মনে হয়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ

প্রণয় রায়

সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতায়ণের প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মহিলাদের স্থান অত্যন্ত সম্মাননীয় হলেও ১০০০ বছর ধরে চলা নিরবিচ্ছন্ন বৈদেশিক আক্রমণ, বিদেশি শাসন ভারতের মহিলাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। বহু মনীষীর সামাজিক আন্দোলনে সেই অবস্থার কিছুটা সংশোধন হলেও এখনও অর্ধেক আকাশের মেঘ কাটেনি। সংবিধান প্রণেতারা মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে (অনুচ্ছেদ ১৪৩১৫) পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিলেও, লিঙ্গভেদে সমান মজুরির অধিকারকে এখনও মান্যতা দিতে পারেনি। সেটা এখনও নির্দেশমূলক নীতি অধ্যায় (অনুচ্ছেদ 39 (d))-তেই থেকে গেছে। অর্থাৎ লিঙ্গভেদে সমান কাজে সমান মজুরি এখনও আমাদের দেশে মৌলিক অধিকারভুক্ত হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচনে (অনুচ্ছেদ 243 (D) ও 243 (T) সংরক্ষণের ফলে অবস্থার কিছুটা যদিও উন্নতি ঘটেছে তা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে সামাজিক বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন কীভাবে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির হয়ে তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ক্ষমতা ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মহিলা পদাধিকারীর সংখ্যা, সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এমনকী খোদ সংসদে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মহিলারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে। যদিও বার বার দেখা গেছে সুযোগ পেলে মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে সক্ষম; কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে একটু বেশিই সক্ষম। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে তা প্রমাণ হয়েছে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মহিলাদের পিছিয়ে থাকার পেছনে বহু সামাজিক বিশ্লেষক ভারতবর্ষের মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ না হওয়াকেই দায়ী করেন। যদিও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর হাতেই সংসার চালানোর চাবিকাঠি থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সংসার চালানোর আর্থিক দায়দায়িত্বকে নারীর কর্তব্য বলে ধরে নেওয়া হলেও পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নারীর অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। হিন্দি সিনেমায় সাতের দশকে প্রায়ই দেখা যেত পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে অভাবী মা নিজের মঙ্গলসূত্র বন্ধক রাখছেন।

মহাজনদের সামনে বারবার দৌড়ে যেতে হয় মায়েদেরই। কখনও মেয়ের বিয়ের জন্য আবার কখনও পরিবারের বিপদে আপদে। সঞ্চয় আমাদের দেশের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। ভারতবর্ষের মহিলারা রান্নার প্রাকমুহূর্তেও একমুঠি চাল তুলে রাখে ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে। তা সত্ত্বেও নারীদের পরিবারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সেভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না বহুক্ষেত্রে। ফলে তাদের হাতে যৎসামান্য টাকা ছাড়া কিছুই থাকে না। এমনকী বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া স্ত্রীধনের উপরও তার অধিকার থাকে যৎসামান্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয় প্রবণতা থেকেই বহু স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা সোনার-রুপোর গহনা কিনে রাখে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সময় সেইসব গহনার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না ভালো মানের সোনা-রুপো না হওয়ার দরুন। বহু ক্ষেত্রে এই সব মহিলা নানা চিটফান্ড কোম্পানির পাল্লায়ও পড়ে যায়। সঞ্চয়িতা হোক বা সারদা প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের

জনধন প্রকল্পের সুবিধা

- শূন্য টাকার অ্যাকাউন্ট।
- অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গে এটিএম কার্ড দেওয়া।
- ৫০০০ টাকা অগ্রিম তোলার সুবিধা।
- ৩০০০০ টাকার বিমার সুবিধা।
- আধার কার্ড থাকলে ব্যাঙ্কখাতা খুলতে অন্য কোনো কাগজ লাগে না।
- কোনো পরিচয়পত্র না থাকলেও শর্তযুক্ত ব্যাঙ্কখাতা খোলা যায়।

মহিলারা। কিছু ক্ষেত্রে কষ্ট করে রোজগার করা টাকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সেগুলি ছিনিয়ে নেয়। কিছু ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানের পুরো টাকাও উপযুক্ত হাতে পৌঁছুয় না বা পৌঁছলেও যৎসামান্য। এক্ষেত্রেও এর শিকার ক্রমশ মহিলারাই হয় বলে সমীক্ষায় বারবার উঠে এসেছে। আর্থিক ক্ষমতায়ণ না হওয়ার কুফল কেরলের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। কেরল স্ত্রী-শিক্ষা ও সার্বিক শিক্ষায় দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে। সেখানে দেখা গেছে, যাদের হাতে নিজস্ব নগদ টাকা বা সম্পত্তি নেই সেই সমস্ত মহিলার ৪৯ শতাংশই তাদের নিকট আত্মীয়দের কাছে নিগ্রহের স্বীকার হয়েছে বলে অকপটে স্বীকার করছে সমীক্ষকদের সামনে। প্রায় সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞই মহিলা ক্ষমতায়ণের সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে ভারতীয় মহিলাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সঙ্গে যুক্ত না থাকাকে দায়ী করেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের অভাব ও ব্যাঙ্ক থাকলেও পরিবারের মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকাটা বড় সমস্যা। আবার ইচ্ছা থাকলেও কখনও লজ্জা বা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার জটিলতা বা কাগজপত্রের ঝামেলাকে দায়ী করে মহিলারা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেনি। স্বাধীনতার প্রায় ৬৬ বছর পরেও দেশের বেশিরভাগ মহিলার ব্যাঙ্কে কোনো খাতা ছিল না। ২০১৩ সালে দেশের মাত্র ৩৯ শতাংশ মহিলার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল; পুরুষদের একটু বেশি পায় ৫৫ শতাংশ।

১৫ আগস্ট ২০১৪ সালে লালকেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনধন যোজনার কথা ঘোষণা করেন। এই যোজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'এবার মানুষ খাতা খুলতে ব্যাঙ্কে যাবে না, ব্যাঙ্কগুলিই বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাতা খুলবে।' শুরু হলো এক মহাযজ্ঞ। দেশের সবকটি সরকারি, বেসরকারি, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হই হই করে প্রস্তুতি শুরু করল। ব্যাঙ্কগুলি একের পর এক শাখা বিস্তার শুরু করে। এই মুহূর্তে দেশে ১১৫০৪২টি ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে। এটিএম সংখ্যা ১৬০,০৫৫টি, যার মধ্যে বেশ কিছু ই-কর্নার অর্থাৎ টাকা জমা ও তোলার দুইয়ের সুবিধাই রয়েছে। নিয়োগ করা হয় ১.৪ লক্ষ ব্যাঙ্ক মিত্র যারা ব্যাঙ্কহীন এলাকায় ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেয়। বহু কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) চালু করে ব্যাঙ্কগুলি। সেখানে সীমিত সীমার মধ্যে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হয়। বিরাট নেটওয়ার্ককে কাজে লাগাতে পোস্ট অফিসকে ব্যাঙ্কে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু বছর পর বেসরকারি একটি সংস্থা ব্যাঙ্ক হিসেবে মান্যতা পায় যার নাম বন্ধন ব্যাঙ্ক। পশ্চিমবঙ্গেই এই মুহূর্তে রয়েছে তার ৪৩৯৬২ টি শাখা-সহ ২৩,৩৩৪টি এটিএম। ২৪ আগস্ট ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী এই যোজনার শুভারম্ভ করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে সব ব্যাঙ্কের প্রধানদের চিঠি দিয়ে যোজনা সফল করার আবেদন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের প্রত্যেক পরিবারের কমপক্ষে একজনের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা জাতীয় অগ্রাধিকার। প্রথম দিনই মোট ১.৫ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। শুরু হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কিং অভিযান। সবশেষে, ৯ নভেম্বর ২০১৬-তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় এখন পর্যন্ত মোট ২৫.৫১ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যার ১৫.৬৭ কোটি খোলা হয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। শহর এলাকায় সংখ্যাটা ৯.৮৩ কোটি। মোট ১৯.৪৩ কোট Rupay কার্ড (ডেবিট কার্ড বা এটিএম কার্ড) দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাঙ্ক খাতাগুলিতে ২ নভেম্বরের তথ্য অনুযায়ী জমা ছিল মোট ৪৫৩০২ কোটি টাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে খোলা হয়েছে মোট ২.৪৩ কোটি খাতা যার ১.৭ কোটি গ্রামীণ অঞ্চলে ও ৭৩ লক্ষ শহর অঞ্চলে। খাতাধারীরা তাদের খাতায় জমা করেছে প্রায় ৬২৮৬ কোটি টাকা। ১.৬ কোটি Rupay কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপুলসংখ্যক ব্যাঙ্ক খাতার এক বড় অংশই মহিলাদের। সবশেষ ২০১৫ সালের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের ৬১ শতাংশ মহিলা ও ৬৯ শতাংশ পুরুষের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে অর্থাৎ ২০১৩ সালে ব্যাঙ্ক খাতা অনুসারে যে-জেন্ডার গ্যাপ ১৬ শতাংশ ছিল তা কমে ৯ শতাংশে নেমেছে। গত এক বছরে এই গ্যাপ আরও কমেছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী এই যোজনার সাফল্যকে 'আর্থিক স্বাধীনতার' সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেহেতু সরকারি নীতি অনুযায়ী সমস্ত আর্থিক সুবিধা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া শুরু হয়েছে এবং জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে বাড়ির মহিলারাই বাড়ির প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ফলে সরকারি অর্থ সরাসরি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে। সরকারি উজালা প্রকল্পেও (বিনা পয়সায় গ্যাস কানেকশন প্রকল্প) সরকারি ভরতুকি মহিলাদের ব্যাঙ্কখাতাতেই পাঠানো হচ্ছে। এখানেও মহিলাদের পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ইন্টার মিডিয়ার সার্ভে অনুযায়ী দেশের ৪৪ শতাংশ মহিলার নিজস্ব মোবাইল রয়েছে এবং ৮৭ শতাংশ মহিলা পুরুষ আত্মীয়ের মাধ্যমে বা নিজস্ব বা দোকানে গিয়ে ফোন ব্যবহার করতে পারে। ফলে মোবাইল-এর মাধমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। বনগাঁ থেকে আসা সবিতা দাস (৪০) দমদমে কয়েকটি বাড়িতে কাজ করেন। তিনি বলেন, আগে নগদ টাকা দেখলে স্বামী কেড়ে নিয়ে মদ খেত এখন ব্যাঙ্ক খাতা খোলার পর আমি টাকা দমদমে একটি ব্যাঙ্কেই রাখি'। (নাম পরিবর্তিত)

দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্যবিত্ত সারদা সরকারের কথায় বড় আফশোস। তার কথায় বড় মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না জমিয়েছিলাম, বিয়ে দিলাম কম বয়সে, কিন্তু ছোট মেয়ের জন্য আর গয়না না কিনে কিছু কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম গত দুই বছর। মেয়ে যখন একদিন এসে বলল মা কলেজে ভর্তি হব টাকা দাও, তখন আর না করতে পারিনি। এখন ও অঙ্ক নিয়ে কলেজে পড়ছে। মাস গেলে ২০০০ টাকা টিউশন পড়ায়। বড় মেয়েকে টাকার অভাবে পড়াতে পারিনি কিন্তু জমানো গয়না দিয়ে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম ১৭ বছর বয়সে। বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে মেয়েটা মারাই গেল। তখন যদি গয়না না গড়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমাতাম!" (নাম পরিবর্তিত) ▮

ভারতীয় চিত্রশিল্পে নারীর ক্ষমতায়ণ

পর্ণা মুখার্জী

কোনো দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক বোধের উপর। শিল্প সংস্কৃতির পরিকাঠামো তৈরি হয় সেই দেশের নারীর রুচিশীলতা বোধ, পরিমিতি বোধ ও নান্দনিক বোধ তথা শিল্পবোধের দ্বারা। এই শিল্পবোধ আমাদের প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে ছড়িয়ে আছে আনাচে-কানাচে। ভারতীয় শিল্পের জগতে নারীরা কখনো শিল্প হয়ে, কখনো অন্য শিল্পীর প্রেরণা হয়ে কাজ করে এসেছেন। ঋক্‌বেদের যুগে সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ীর কথা আমাদের সকলের জানা এবং বৈদিকযুগে ভারতবর্ষের শিল্প ও সাংস্কৃতিক উন্নতি অনস্বীকার্য। উপনিষদে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্মে নারীকে লক্ষ্মীর রূপ হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার শক্তি উপাসকরা দেবীমার রূপকেই এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকর্ত্রী হিসেবে গণ্য করেন। বৈদিক যুগের নারী থেকে শুরু করে রামায়ণের সীতা কিংবা মহাভারতের দ্রৌপদী বুদ্ধি, ক্ষমতা, ত্যাগ ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

সময় পাল্টেছে। আমরা উন্নতি করেছি বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়। সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান খাটো হয়েছে। যদিও সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা বসে আছেন। এরজন্য দায়ী সার্বিক শিল্পবোধের অভাব যা শিল্পে নারীর জাগরণই পূরণ করবে। ভারতীয় নারীরা চারুশিল্পে, কারুশিল্পে, লোকশিল্পে নিজেদের উল্লেখযোগ্য শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন। লোকশিল্প ভারতের দেশজ সম্পদ ও পরম্পরার বার্তা বহনকারী। দেওয়াল রাঙানোয় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাঁওতাল রমণী, বিহারের মিথিলা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় রমণী যিনি মধুবনী চিত্র অঙ্কনেরত, মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলের 'গঁদ' শিল্পী কিংবা মহারাষ্ট্রের 'ওয়ারলী' শিল্পীরা সবাই মূলত নারী। তারা একাধারে বুনেছেন যেমন সংসার, তেমনি নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনায় রাঙিয়েছেন বাড়ির দেওয়াল।

সুনয়নীদেবীর চিত্র

আঁকায় বেঁধেছেন লোকগান কিংবা মেতেছেন নানান লোকনৃত্যে। এঁরাই লোকশিল্পের ধারক ও বাহক। ভারতীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণে ভারতীয় নারীরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন শিল্পের উৎকর্ষতার মান্যতাকে। বাংলার আলপনা, মহারাষ্ট্রের রঙ্গোলী, বিহারের আরিপনা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুগ্গু ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির অঙ্গ যা বাড়ির মহিলারা তাদের শিল্পমনস্কতা দিয়ে অনুশীলন করে চলেছেন বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মঙ্গল সাধনে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ট্যাটু কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী মাদুর, বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, থলি, কাঁথা ইত্যাদিতে মহিলারা তাদের শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে আসছেন এবং বনবাসী সমাজের শৃঙ্খলাবোধ আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের শৃঙ্খলার থেকে অনেক সহজ, সরল ও উন্নত। এরপর আসি সূক্ষ্মশিল্পের কথায়। শিল্পী হয়ে ওঠার জন্য চাই পরিবেশ। ভারতীয় শিল্পের উন্নতির যাত্রা তৈরিতে জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অবদান আমাদের সকলের জানা। সেই ঠাকুর বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি সুনয়নী দেবী (জন্ম ১৮৭৫-মৃত্যু, ১৯৬২) ছেলেবেলা থেকেই দেখেছেন অবনীন্দ্রনাথকে চিত্র রচনা করতে। প্রত্যক্ষভাবে কোনো প্রশিক্ষণ না পেলেও স্বামী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ণ সমর্থনে সুনয়নীদেবী হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর এক লেখায় সুনয়নী দেবীকে (চট্টোপাধ্যায়) বলেছিলেন, 'ভারতের প্রথম মহিলা শিল্পী।' সুনয়নী দেবীর চিত্রে লোকশিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। সরল আঙ্গিকে, সাবলীল ধারায় তিনি রচনা করেছেন ছবি। তাঁর শিল্পের প্রেরণা ছিল তাঁর স্বামী, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর সংসার। তিনি নিজেকে বলেছেন অন্দরমহলের শিল্পী। তাঁর চিত্রে মা যশোদা, বৃন্দাবনের গোপিনী, বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, মহাদেব-সতী, অর্ধনারীশ্বর, কৃষ্ণ-বেশী বালক, সাধিকা, বাউল, সখী পরিবৃত বিবাহের বধু ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রকাশ পেয়েছে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর ছবির অপরিকল্পিত সারল্যই পরবর্তী প্রজন্মের আঙ্গিক ভাবনায় অন্যতম প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। এরপর আসি অমৃতা শেরগিলের কথায়। মাত্র ২৮ বছরের জীবনে তিনি শুধু নিজেকে দক্ষ চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রমাণ করেছেন তাই নয়, ১৯৩৩ সালে 'কনভার্সেশন' শিরোনামের একটি চিত্র তাঁকে প্যারিসের 'গ্রান্ড সালোঁ'র অ্যাসোসিয়েট হিসাবে নির্বাচিত করে। তিনি এশিয়ার প্রথম শিল্পী যিনি এই 'গ্রান্ড সালোঁ'তে জায়গা করে

অমৃতা শেরগিলের চিত্র।

নিয়েছেন। ১৯৩৫-৪১—এই ছ'টি বছর তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ভারতীয় বিষয় নিয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর রচিত 'বেনানা সেলার', 'হিল মেন', 'হিল উইমেন', 'ব্রহ্মচারীজ', 'হলদি গ্রাইন্ডার' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্র। বিশ্ব আঙ্গিকে স্বদেশের আত্ম-পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টাতেই অমৃতা শেরগিলের আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য। ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য বরোদার শিল্পী ও 'গ্রুপ ১৮৯০'-এর সদস্যা জ্যোতি ভাট (১৯৩৪)-এর চিত্র প্রকাশ পায় পৌরাণিক বিষয় যা লোকশিল্পের সারল্যতায় প্রকাশিত এবং এই প্রকাশ একেবারেই ভারতীয় ও দেশজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'স্পিরিচুয়াল সিম্বল' ও সিম্বলিক রঙের প্রয়োগ। চিত্রের উপাদানগুলি সেজে উঠেছে কাঁথার বুনটের ন্যায়। ষাটের দশকের আরেক জন উল্লেখযোগ্য শিল্পী অর্পিতা সিং (১৯৩৭) যিনি তাঁর শিল্পের সুনিশ্চিত মৌলিক শিল্প স্বতন্ত্রতার যাত্রা রচিত করেছেন সত্তরের দশক থেকে নব্বইয়ের দশকে। ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর রচনা করেছেন তাঁর চিত্র। তাঁর চিত্র নকশিকাঁথার বুননের ন্যায় বুনেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার গল্পগাঁথা সরল আঙ্গিকে। শানু লাহিড়ি (১৯২৮-২০১৩) রচনা করেছেন তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রয়োগে 'পাবলিক আর্ট' কিংবা 'গ্রাফিটি আর্ট'কে কেন্দ্র করে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই মূর্ত হয়েছে তাঁর রচনায়। সত্তরের দশকের ভারতে আধুনিকতার বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারী শিল্পী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাধবী পারেখ (১৯৪২), অঞ্জলি এলামেনন (১৯৪০) ও নলিনী মালানি (১৯৪৬)। অঞ্জলি এলামেননের (১৯৪০) চিত্রে মধ্যযুগীয় বাইজানটাইন ও রোমানেস্ক শিল্পের মরমি সৌন্দর্যের আলোকে প্রকাশ পেয়েছে ভালোবাসা, করুণা ও প্রতিবাদী অনুভব তৈরি হয়েছে এক অনন্য রূপকল্প। এই দশকের শিল্পী মাধবী পারেখের (১৯৪২) চিত্রে লৌকিক ও পরম্পরাগত আঙ্গিকের আধুনিক প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক বলিষ্ঠভাবে। গুজরাটের লৌকিক সারল্য যা তাঁর আশৈশব স্মৃতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুসঙ্গ নিজস্ব ভঙ্গিতে। তাঁর চিত্রে ফুটে উঠেছে নকশিকাঁথার মতো এক রূপকথার রূপকল্প যা সচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। নলিনী মালানী (১৯৪৬) বর্তমান সমাজের সুতীব্র সঙ্কট ও বিপন্ন পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি সংঘাতকে প্রতিবাদী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর চিত্রে। এবং যুক্ত হয়েছে অস্তিত্বের সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ। জন্মসূত্রে করাচীর ও জে. জে. স্কুল থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত নলিনী মুম্বাইয়ের একজন সফল শিল্পী। তাঁর তেলরঙের 'উইম্যান সিরিজ'-এর মধ্যে ১৯৭৪-এ রচিত হলুদ, কালো ও লালের তীব্র সংঘাতে রচিত চেয়ারে বসে থাকা এক নগ্নিকার রূপকল্প আমাদের ভাবায়। আশির দশকে সারা ভারতের চিত্র শিল্পের জগতে যে নারীরা সচলতা এনেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জয়শ্রী চক্রবর্তী, জয়া গাঙ্গুলী, তপতী সরকার, শাকিলা, জয়শ্রী বর্মন, শিপ্রা ভট্টাচার্য, অর্পণা কাউর, দিপালী ভট্টাচার্য প্রমুখ। তপতী সরকার (১৯৫০) তাঁর বলিষ্ঠ ড্রইংয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার প্রতিবাদের প্রতিমায় অভিব্যক্তির তীব্রতর প্রকাশ থাকে জয়া গাঙ্গুলীর ছবিতে। দিপালী ভট্টাচার্য (১৯৫২)-এর ছবিতে স্বাভাবিকতা ও স্বাদুতার প্রকাশ থাকে প্রগাঢ় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও করুণাদীর্ণ জীবনের রূপ। শিপ্রা ভট্টাচার্য (১৯৫৫)-এর সরল রূপায়ণে সাধারণ জীবনধারার ক্লিষ্ট মানুষের অন্তর্নিহিত বাস্তবতাটির সন্ধান করেছেন অবয়বী ভাষায়। জয়শ্রী চক্রবর্তী (১৯৫৬) অবয়নের রূপকল্পের অনুসঙ্গে রচনা করেছেন এক মরমি সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। জয়শ্রী বর্মনের (১৯৬০) ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে হিন্দু-পুরাণ রূপকল্পের বিষয়বস্তু আলংকারিক আঙ্গিকে যা ভারতীয়, যা দেশজ। অপর্ণা কাউর (১৯৫৪) কোনো তথাকথিত প্রশিক্ষণ ছাড়াই রচনা করে চলেছেন অনন্য সাধারণ চিত্র যেখানে ফুটে উঠেছে ভারতীয় সমাজ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু। সিম্বলিক কালার ও মায়ার রূপকল্পে তাঁর চিত্রের আঙ্গিক সুসঙ্ঘবদ্ধ। কোলাজ মাধ্যমের বিশিষ্ট শিল্পী শাকিলা জন্মসূত্রে একজন কৃষক পরিবারের মেয়ে হয়েও স্বচেষ্টায় ভারতীয় আধুনিক চিত্রশিল্পের জগতে উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছেন গ্রামীণ জীবনের নানান দৃশ্যাবলীর সহজ ব্যক্তকরণে। তাঁর চিত্রে ঘটেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়। তাঁর কাজ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। এইভাবেই যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে ভারতীয় চিত্রশিল্পে নারীর ক্ষমতায়ণের যাত্রা— এই প্রবন্ধে উল্লেখিত ও আরো অজস্র অলিখিত শিল্পীর হাত ধরে। নারীর শিল্পসত্তা কখনো হয়েছে ভাবকল্পের আশ্রিতা, আবার কখনো বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতির প্রতিবাদী মুখর রূপ। তবে বর্তমানে বাণিজ্য শিল্পের নানান স্থানে নারী পণ্য রূপে, ভোগবাদী বস্তুরূপে অবমাননার স্বীকার, যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। না হলে ঘটবে না সনাতন ভারতীয় শিল্পবোধের উন্মেষ যা নান্দনিক ভারসাম্যযুক্ত, যা পরিশীলিত।

যেখানে মহিলারা কোনোদিন বিধবা হয় না

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। মন্দোদরী-সহ রাক্ষসকুলের অন্যান্য বিধবাদের সান্ত্বনা দিতে স্বয়ং শ্রীরাম এসেছেন লঙ্কাপুরীতে। মন্দোদরী যথাবিহিত উপাচারে অতিথির সৎকার করলেন। শ্রীরাম তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'চির সীমান্তিনী হও।' মন্দোদরী বিস্মিত, বিমূঢ়। যার স্বামী যুদ্ধে নিহত তাকে এই আশীর্বাদ করার অর্থ কী! কথাটা জিজ্ঞাসা করা মাত্র শ্রীরাম বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। তবে কথাটা একবার বলেছি যখন মিথ্যে হবে না। চিতা না নিভলে মানুষের মৃত্যু হয় না। তোমার স্বামীর চিতা কোনোদিন নিভবে না। তুমিও থাকবে চিরসীমন্তিনী।'

রামায়ণের বহুচর্চিত কাহিনিটি মনে পড়ে গেল গোন্দ জনজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথার কথা জানার পর। মধ্যপ্রদেশের মান্দলা জেলা। হাজার চেষ্টা করলেও এখানে কোনো

বিধবাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে বিবাহিত মেয়েরা চির-সীমন্তিনী। মন্দোদরীর মতো। যদিও পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে। গোন্দদের পরম্পরা অনুযায়ী, যদি কোনো মহিলার স্বামীর মৃত্যু হয় তিনি পরিবারের যে কোনো অবিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন। এমনকী সেই পুরুষ যদি মহিলার নাতি হয় তা হলেও সমাজ কোনো আপত্তি করে না।

কিন্তু পুরুষটি যদি বিধবাকে বিয়ে করতে রাজি না হন কিংবা বিবাহযোগ্য পুরুষ যদি না পাওয়া যায়, তখন? তারও উপায় আছে। এইসব ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর ঠিক দশদিন পর সদ্যবিধবার হাতে বিশেষ ডিজাইনে তৈরি রুপোর বালা পরিয়ে দেন গ্রামের প্রবীণেরা। এই রুপোর বালাকে গোন্দ ভাষায় বলে পাটো। হাতে পাটো পরার পর বিধবা আর বিধবা থাকেন না। তিনি তখন এয়োস্ত্রী। গ্রামের যে মহিলা পাটো পরানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার বাড়িটাই হয়ে ওঠে নতুন এয়োস্ত্রীর ঠিকানা।

দাদু যখন মারা যান তখন পাতিরাম ওয়ারখাড়ের বয়েস মোটে ছ' বছর। কিন্তু দাদুর মৃত্যুর ন' দিনের মাথায় ঠাকুরমা চামরি দেবীর সঙ্গে তার বেশ ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল। গোন্দদের মধ্যে নাতি পাটোর রমরমা একটু বেশি। নাতি-ঠাকুরমার চিরাচরিত রসের সম্পর্কের পরিণতি যদি এত মধুর হয় রমরমা হবারই কথা। পাতিরাম বলেন, 'বিয়ের পর আমরা প্রতিটি ধর্মীয় আচার পালন করেছিলাম। বড় হয়ে আমি নিজের পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করি। ছোটবেলায় একবার বিয়ে হয়ে গেছে বলে আমাদের সমাজ বড়বেলার বিয়েতে বাধা দেয় না।' পাতিরামের বয়েস এখন ৪২ বছর। থাকেন বেহাঙ্গা গ্রামে। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে তার বেশ সুখের সংসার। মারা গেলেও চামরি দেবী তার প্রথম স্ত্রী। গোন্দ সমাজের নিয়ম।

গোন্দ সমাজ কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব উদার। বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর বয়েসের পার্থক্য যেহেতু প্রায়শই খুব বেশি হয়, তাই শারীরিক সম্পর্কের অবকাশ এখানে নগণ্য। তবুও যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সমাজ মেনে নেয়। কিন্তু সমাজের একটা অন্যদিকও আছে। ৭৫ বছরের সুনদারো বাঈ কারওয়াতি স্বামীর মৃত্যুর পর দেবর সম্পতকে বিয়ে করেছিলেন। সম্পতের বয়স এখন ৬৫। সুনদারো বলেন, 'বিয়ের দু' বছর পর আমার স্বামী মারা যায়। আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমার দেওর গোড়ায় রাজি হয়নি। যখন দেখল বিয়ে না করলে দাদার শ্রাদ্ধে গ্রামের কেউ খাবে না তখন রাজি হলো। এখন আমরা সুখী।' কৃপাল সিং ওয়ারখাড়ে তার শ্যালিকাকে বিয়ে করেছেন। শ্যালিকা বয়েসে তার থেকে পাঁচ বছরের বড়ো। কৃপাল বলেন, 'এটা আমাদের রীতি। একটা মেয়ে কেন সারাজীবন বিধবা হয়ে কাটাবে?' শুধু মান্দলা গ্রামে নয়, গ্রামের বাইরে গিয়েও গোন্দরা এই প্রথা মেনে চলেন। জনজাতি নেতা গুলজার সিং মারকাম বলেন, 'শিক্ষিত গোন্দদের মধ্যেও এই প্রথা বেঁচে আছে। আমি দু'জন ইঞ্জিনিয়ারকে চিনি যারা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসে চাকরি করে। দু'জনেই তাদের বিধবা বৌদিকে বিয়ে করেছে।'

সীমন্তিনীরা ভালোই আছেন মান্দলা গ্রামে। মৃত্যু কেড়ে নিচ্ছে অনেক কিছু কিন্তু পুরোপুরি নিঃস্ব করতে পারছে না। ▮

দিদি কোটিমাত্র বস্তাবৃত হইয়া

অভিমন্যু গুহ

এই হলো গিয়ে আমাদের মুশকিল। কারণে-অকারণে, বুঝে-না বুঝে খালি দিদির ওপর চোটপাট করা কেন রে বাপু? চোটপাট করার জন্য আর কি কেউ নেই? আমাদের দিদি কত মহান সে খবর রাখিস গো-মুখ্যুগুলো? থুড়ি, 'গো' শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক নয়। ইংরেজিতে 'যাওয়া' বোঝায়। কিন্তু বাংলায় শব্দটা ভারি সাম্প্রদায়িক। গো বললে আমাদের দিদির মুসলমান ভাইদের কতটা অপমান করা হয় তা জানিস? গো হলো গিয়ে খাবার জিনিস। প্রকাশ্যে গো-হত্যা হলো সাম্প্রদায়িকতার ছেরাদ্দ করা। দিদির সেনাপতি বলেছে আমি আমার বউয়ের সঙ্গে থাকব কিনা সেটা আমাকেই ঠিক করতে দিন। ঠিকই তো, বউ গেলে না হয় আরেকটা বউ পাওয়া যাবে। কিন্তু একপিস ইমাম গেলে আর এক পিস ইমাম কি জুটবে? ওরে হতচ্ছাড়া 'পিস' কথাটা ভালো করে খেয়াল কর। ইসলাম হলো গিয়ে পিস (peace) অর্থাৎ শান্তির ধর্ম। যদি নাই মানবি তো পিস (piece) পিস করে কাটব। ওরে ছোঁড়া ভারতীয় সংবিধান দেখাবি বুঝি কিংবা আইন আদালত? ওসব ল কলেজে গিয়ে পড়িস। আমাদের দিদির রাজত্বে শরিয়তি আইন চলে। দিদি হলো গিয়ে পরমহংসের মতো। দুধটুকু খান, জলটুকু ফেলে যান। নইলে ধর না কেন তালাকের বেলায় শরিয়তি আইন, আর সাধারণ চুরি-ছিনতাই, রাহাজানি-ধর্ষণের বেলায় চালাকের আইন, থুড়ি এদেশীয় আইন। আহা এসব ক্ষেত্রেও তো দিদি শরিয়তি আইনের পক্ষে সওয়াল করতে পারতো। কিন্তু দিদিকে কি তোরা বোকার হদ্দ ভাবিস? ওরে চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি-ধর্ষণে না জানি শরিয়তি আইনে পাথর ছুঁড়ে মারবে না হয় চোখ দুটো উপড়ে নেবে। ওরে তোদের কি হৃদয়-টিদয় বলে কিছু নেই? মুসলমান ভাইদের এই কষ্টগুলো দিদির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব! খাগড়াগড়ের কথা মনে নেই? বনগাঁ থেকে কালিয়াচক মুসলমান ভাইদের জন্য দিদির উথলে ওঠা দরদের কথা কস্মিনকালে ভেবে দেখেছিস তোরা?

তবে যাই বল দিদি যে বিবেকানন্দের এতখানি ফলোয়ার সেটা কেউ জানতে পারত না যদি না ওই সাম্প্রদায়িক প্রধানমন্ত্রীটা পাঁচশো, হাজার টাকার নোটগুলো বাতিল করতো। স্বামীজী ভারতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আমাদের দিদিও বেরোবেন। স্বামীজী যেমন বলেছিলেন 'তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া', আর দিদি 'কোটি' মাত্র বস্তাবৃত হচ্ছেন। এর দু'টো মানে হয়। প্রথমত বস্তায় কোটি টাকা আছে আর দ্বিতীয়ত এরকম বস্তার সংখ্যাও কোটিখানেক। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে বিবেকানন্দ সঙ্ঘ-জননী সারদার ওপর ভরসা রেখেছিলেন। আর দিদির ভরসা চিটফান্ড সারদা। তাঁর যে এমন ভক্ত জন্মাবে সেটা ভাগ্যিস স্বামীজী জানতে পারেননি! জানলে কী করতেন সেটা অবশ্য বলা মুশকিল।

সেদিন দিদির দলের এক সাংসদকে দেখা গেল সংসদে গলা ফাটাচ্ছেন— 'বিজেপি কা পাস কালো টাকা হ্যায়।' আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। মাননীয় সাংসদটির ভাবমূর্তি এককালে ভারী উজ্জ্বল ছিল বটে। তবে নারদার ঘুষে ভাবমূর্তির দফা একেবারে রফা হয়ে গেছে। আর তাঁর সাংসদ এলাকা? ওরে বাবা! সে এলাকা জুড়ে কেবল একটিই ব্যবসা। নাম তার সিন্ডিকেট ব্যবসা। দিদির ভাইদের (জেনেটিক ও নন-জেনেটিক) এই ব্যবসা আপাতত লাটে ওঠার মুখে, কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে। এর পরেও বলতে চাস 'সততার প্রতীক'-এর রাগ হবে না! শুধু দিদি যখন তর্জন-গর্জন করেন তখন পাঁচ-পাবলিকে কয়— 'একটু আস্তে কত্তী। ঘোড়ায় হাসবো যে!' ▮

মুলো একটি বহুগুণ সম্পন্ন সবজি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

'উচ্ছে বেগুন পটল মুলো, বেতের বোনা ধামা কুলো'— উচ্ছে পটলের দিন শেষ,...এসে গেল মুলোর দিন, অর্থাৎ শীতকালীন সবজির দিন। বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় পাঁচমিশালি লাবড়া ও ঘন্টর প্রধান উপকরণ হলো মুলো। বলাবাহুল্য, মুলো শুধু বাংলা বা বাঙালির মধ্যেই সীমাবদ্ধতা নয়। চাইনিজ ও কোরিয়ানদের মধ্যে মুলোর ব্যবহারের পরিধিটা বাঙালিদের চাইতে বেশি বই কম নয়।

সাধারণত আমরা মুলোকে ইংরেজিতে Radish বলেই জানি। কিন্তু জাপানিজ্‌রা গাজরের সঙ্গে এর আকারগত সাদৃশ্য থাকায় মুলোর নামকরণ হয়েছে 'ডাউকন'। ব্যাখ্যা হলো— জাপানিজ শব্দ দাই কথার অর্থ হলো বড় এবং 'Kon' শব্দের অর্থ শক্ত।

মুলোর চাহিদা মোটামুটি ভাবে কোরিয়া, চায়না, জাপান, ভিয়েতনাম এবং ভারতবর্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে একমাত্র ভারতেই মুলোকে কাঁচার চাইতে রান্না করে খাওয়ার রেওয়াজটাই বেশি। তুলনামূলকভাবে বাইরের দেশগুলিতে কাঁচা খাওয়ার চলটাই প্রচলিত। যেমন— বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে 'মুলি কা পরাঠা' একটি বিশেষ আকর্ষণীয় রেসিপি। 'জাপান' ও 'চায়না'তে ইংরেজি নববর্ষে অতিথি আপ্যায়ন কাঁচা মুলো দিয়েই করা হয়। তাই শাক-সবজির জগতে মুলোকে বহুগুণ সম্পন্ন সবজি হিসেবে গণ্য

করা হয়। কাঁচামুলোর ব্যবহার স্যালাড হিসেবে নুন ও গোলমরিচ দিয়ে বহু দেশেই এর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এবং সঙ্গে কচি মুলোপাতা খাওয়ার প্লেট সাজাতে অর্থাৎ গার্নিসিং করতে প্রায় সব দেশের মানুষই পছন্দ করেন।

এবারে আসি মুলোর সাতকাহন নিয়ে। এটি অত্যন্ত লো ক্যালোরি সবজি। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মুলোর থেকে মুলোর পাতার বা শাকের গুণাগুণটা একটু হলেও বেশি। কারণ পাতার মধ্যে থাকছে— পর্যাপ্ত মাত্রায় বিটা-ক্যারোটিন, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও ভিটামিন-ডি ইত্যাদি, যা কিনা ত্বকের পোড়া ভাব বা কালচে ভাব দূর করে সঙ্গে রুক্ষতা দূর করতে সাহায্য করে। আর মুলোর বিশেষ বিশেষত্ব হলো এটি ভিটামিন-ইউ-র ভাণ্ডার। আসলে ভিটামিন-ইউ হলো একটি এনজাইম বিশেষ। যে এনজাইমার S-methy lmethionine হিসেবেই বেশি খ্যাতি লাভ করেছে। এটি মুলো ছাড়াও বাঁধাকপি, ব্রোকলি, পালং শাক ইত্যাদিতেও আংশিক রূপে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে পেপটিক আলসার, Gastrointestinal disorders, Sunburn, Stomach infection ইত্যাদিতে মুলোর ব্যবহারের নির্দেশ উল্লেখ আছে। কারণ এই রোগগুলিতে ভিটামিন-ইউ হলো একটি অব্যর্থ ওষুধ বিশেষ। মুলো হলো Brassicaceae পরিবারভুক্ত। বৈজ্ঞানিক নাম হলো--- Raphanus sativus Var.longipinnatus। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুলো, মুলি, মুল্লি নামেই পরিচিত। ■

আচার্য-আচার্যা চাই (শিক্ষক, শিক্ষিকা)

প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ভবন

একটি সেবামূলক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০১৭-তে শুরু হচ্ছে। এর জন্য ৩ জন আচার্য-আচার্যা প্রয়োজন।

একজন — B. Sc / M. Sc, B. Ed, (Pure Science)

একজন — B. A / M. A, B. Ed, (English)

একজন — B. P. Ed (Physical Education)

আগ্রহী ব্যক্তিদের আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে জীবনপঞ্জী-সহ (বায়োডাটা) দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

সরস্বতী বিদ্যা মন্দির

গ্রাম - তাঁতিবেড়িয়া, ডাক - কুশবেড়িয়া, থানা - উলুবেড়িয়া

জেলা - হাওড়া, পিনকোড নং - ৭১১ ৩১৬

মঙ্গলনিধি

গত ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার প্রচার প্রমুখ অঙ্কুর দাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা অজিত দাস ও মা শ্যামলী দাস তাঁদের পুত্র ও নববধূর হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও এক প্রবীণ প্রচারক শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী কুমার সরকার, সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, সহপ্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ অঙ্কুর সাহা, মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ দাস, বিভাগ কার্যবাহ রামেশ্বর পাল, বিভাগ সেবা প্রমুখ দীপঙ্কর কমল বর্মা-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুরাতন মালদহ খণ্ড বৌদ্ধিক প্রমুখ সুরজিৎ দাস তাঁর শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৩ নভেম্বর মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন মালদা বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা কার্যবাহ শ্যামল পাল, জেলা প্রচারক মলয় দত্ত-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

মালদা নগরের মাধবনগর শাখার স্বয়ংসেবক তথা নগর মিলন প্রমুখ সূর্য দাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ২৩ নভেম্বর তাঁর বাবা রবীন্দ্রনাথ দাস মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন মালদা বিভাগ সেবাপ্রমুখ দীপঙ্কর কমল বর্মার হাতে। অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ দাস ও তাঁর সহধর্মিণী মীরা দাস গত ২৩ নভেম্বর তাঁদের পুত্র চিন্ময়রঞ্জন দাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে পুত্র ও পুত্রবধূ শাশ্বতীর হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সেবাপ্রমুখ গৌতম মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন জেলা সঙ্ঘচালক মোহিত গোস্বামী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

গত ২০ নভেম্বর মালদা জেলার গৌড় খণ্ডের কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক তথা

গৌড় খণ্ডের কলেজ ছাত্র প্রমুখ কৌশিক ঘোষের পিতা অসিত ঘোষ এবং তার মামা জয়চাঁদ ঘোষ মোটর বাইক দুর্ঘটনায় কমলাবাড়ি জাতীয় সড়কে প্রাণ হারান। তিনি আর পি এফ-এর হেড কনেস্টবল এবং সমাজসেবী হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন। ওই দু'জন স্বয়ংসেবকের অকালমৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর একটি ৭ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে, সেও শিশু স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা খণ্ডের ধান্যছড়া

শাখার কার্যবাহ যমুনাপ্রসাদ মণ্ডল গত ১৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কার্যবাহ এবং বক্সাপাড়া সারদা

সমাবেশ সমাচার

শিশু তীর্থের প্রধানাচার্য সন্তোষ সাহার মাতৃদেবী যমুনাবালা সাহা গত ১৮ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের বাসিন্দা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ লোহিত বরণ দত্তের পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত গত ২৪ নভেম্বর ভোরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলার প্রাক্তন জেলা কার্যবাহ শমিত (টুটুল) দাশের বাবা সন্তোষ কুমার দাশ গত ২৬

নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার দাশ সঙ্ঘের প্রচারক অরবিন্দ দাশের অগ্রজ ছিলেন। তাঁর 'প্রেরণায়' একই পরিবার থেকে তাঁর ২ ভাই অরবিন্দ দাশ ও ভবতোষ দাশ (৮ বছর প্রচারক ছিলেন) এবং তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শমিত দাশ প্রচারক (৯ বছর প্রচারক ছিলেন) হয়েছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

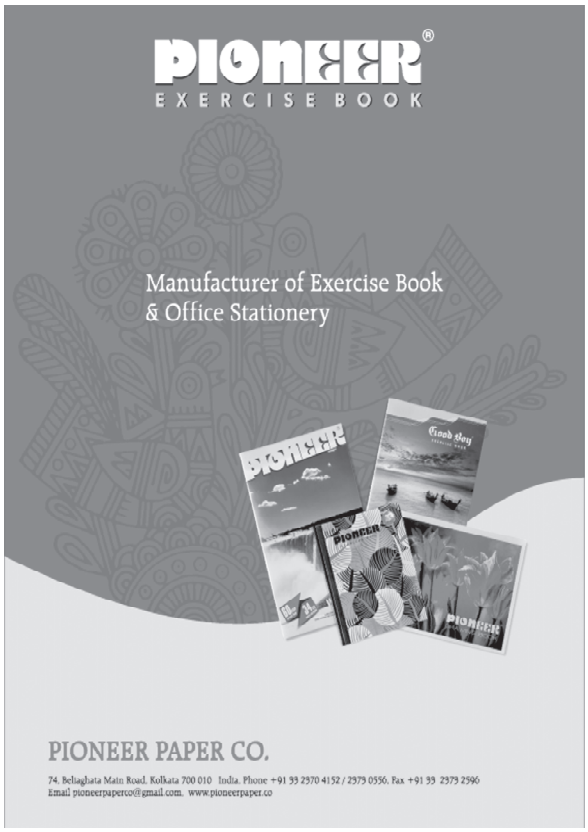

"দীনতার অসীম শক্তি খৃস্টের জীবনে রূপায়িত হয়েছিল। নিন্দিত হয়েও তিনি নিন্দা করেননি, দুঃখ পেয়েও অপরকে ভীতি-প্রদর্শন করেননি। রোমান জগতের বর্বরতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে যে 'চমক' তিনি দেখিয়েছিলেন, এই 'দীনতাই' তার যথার্থ উৎস, যার জন্য তাঁর নাম ও ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দৈহিক শক্তি এবং হিংসাত্মক মনোভাবের ধারা এই প্রথম এমন এক শক্তির ইঙ্গিত পেল যা নীরবে কাজ করে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর ২৫তম প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

গত ৫ ও ৬ নভেম্বর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার কাছে তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর ২৫তম প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন ২২টি শাখা থেকে আগত ২৭৮ জন শিল্পীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো। এবার ছিল সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের ৩০ তম বর্ষে পর্দাপণে ২৫তম প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন। ৫ নভেম্বর শনিবার সকাল ১০টায় বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক চক্রবর্তী ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চিত্রনাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, অখিল ভারতীয় সহ সভাপতি বাঁকেলাল গৌড়, প্রাদেশিক সহসভাপতি সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস, প্রাদেশিক উপদেষ্টা বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রাদেশিক কার্যকরী উপদেষ্টা তথা স্বাগত সমিতির সমিতির আহ্বায়ক সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় এবং প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু প্রমুখ। উদ্বোধনী ভাষণে বিকাশ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৩০ বৎসরে সাংস্কৃতিক জগতে সংস্কার ভারতীর অবদানের কথা বর্ণনা করেন। এরপর কৌশিক চক্রবর্তী সংস্কার ভারতীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়াসকে মহান বলে ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি নিজেও শিল্পী হিসাবে এই মহান সংস্কৃতির সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার করলেন। সভাপতি তপন গাঙ্গুলী সকলকে মনের দিক থেকে সুন্দর থেকে শিল্পী হিসাবে কাউকে আঘাত না করে দেশ তথা সমাজের কাজ করতে বলেন।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয় সার্ধজন্মশতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে শিল্পী রুমা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই পর্বে অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি বাঁকেলাল গৌড় ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের আধুনিক প্রজন্ম যখন অশুভ শক্তির প্রভাব নিজেদের কল্যাণকর সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন থেকে যাচ্ছে, তখন সংস্কার ভারতীই পারে নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে যুবসমাজকে জাগ্রত করতে, যাতে বিশ্বকল্যাণের জন্য আমাদের সংস্কৃতি গতিবান থাকে। এটা নতুন কোনো কাজ নয়, এর আগে স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামানুজ, কবীর, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহান ব্যক্তিরা আমাদের সমাজকে গতিবান রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন, আমাদের প্রতিটি কার্যকর্তা ও কর্মীবৃন্দকে সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

এরপর প্রাদেশিক মাতৃশক্তি প্রমুখ অধ্যাপিকা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের তৎকালীন

সমাজ জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার আত্মবলিদানের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় নারী সমাজে শিক্ষা প্রসারে, বিজ্ঞান গবেষণায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন নিবেদিতাই সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিকে ভারতের উল্লাস ধ্বনি হিসেবে নির্ধারণ করেন।

এই পর্বেই ছিল বাংলার সঙ্গীত জগতের স্বর্ণযুগের গীতিকার শৈলেন রায়, প্রণব রায়, অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী ও সুবোধ পুরকায়স্থের গান নিয়ে শাখা অনুসারে সঙ্গীত প্রদর্শন। বিভিন্ন শাখার শিল্পীরা সুন্দরভাবে পুরনো দিনের গান পরিবেশনের মাধ্যমে স্বর্ণযুগের গীতিকারদের কথা আর একবার মনে করিয়ে দিলেন।

সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গৌড়ীয় নৃত্যের আঙ্গিকে ভাব সঙ্গীত 'সাধয়তে সংস্কার ভারতী' পরিবেশনার মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হোন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং গ্রাহক পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুপ্রিয় সংস্কার ভারতীর কার্যক্রমে আসতে পেরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার পথপ্রদর্শক লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিভিন্ন শাখার পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাধান্য দেখা গেল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাতৃশক্তির জাগরণের অনুষ্ঠানের। পরিবেশিত হলো ভগিনী নিবেদিতার জীবনী অবলম্বনে অনুষ্ঠান। এছাড়াও ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পরিবেশিত হলো সমবেত সঙ্গীত। বাউল, কীর্তন, সবুজ বিপ্লব, রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার উপর উনুষ্ঠান ছিল আকর্ষণীয়। বিগত বৎসরগুলিতে প্রকাশিত দেওয়াল পঞ্জীকে বিষয় করে অনুষ্ঠানটি ছিল অভিনব। ছিল একটি অনু-নাটক— মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গল্প 'একটি ছাতা ও দুটি মাথা' অবলম্বনে। প্রতিটি অনুষ্ঠানই পরিবেশনার গুণে হয়ে উঠেছিল সুন্দর ও শ্রুতিমধুর।

দ্বিতীয় দিন ৬ নভেম্বর প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশু শিল্পী ছান্দসিক চক্রবর্তীর স্বামীজীর বেশে স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার অংশবিশেষ আবৃত্তির মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক, অভিনেতা ও সুগায়ক অরিন্দম গাঙ্গুলী এবং বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা বিমল চক্রবর্তী। শ্রী গাঙ্গুলী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমরা যখন আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে ক্রমশ একা হয়ে পড়েছি, ঠিক তখনই সংস্কার ভারতী আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের কাজ করছে। শ্রীচক্রবর্তীও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, শ্রীচৈতন্য সমাজকে একটি মাত্র নামের মাধ্যমে বাঁধতে চেয়েছিলেন, আমাদেরও তেমনি সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজে ঐক্যের মেলবন্ধনের কাজ করতে হবে।

সমবেত নৃত্য প্রদর্শনের এবারের বিষয় ছিল 'সংস্কৃতির ধারক বাহক ভারতের নদ-নদী। বিভিন্ন শাখা মূলত গঙ্গা নদীর উপর তাঁদের নৃত্যানুষ্ঠান সুচারুভাবে পরিবেশন করে। নৃত্যানুষ্ঠানের পর্যবেক্ষক ছিলেন নৃত্য শিক্ষক ড. অশোক বেরা।

মধ্যাহ্নে সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী বলেন, সংস্কার ভারতী ললিত কলার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগানোর কাজ করে চলেছে। ভারতবর্ষ সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, প্রাচীন উপনিষদ-বেদ থেকে নেওয়া কলার মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতি চর্চা। তবে আজও কোনো কোনো শিল্পীর মধ্যে সেই রাষ্ট্র ভক্তির সঠিক জাগরণ ঘটছে না। তাই সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের সকল অহঙ্কার ত্যাগ করে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ কলা-সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে সেই রাষ্ট্রভক্তি জাগরণের কাজ গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়।

সম্মেলনে দু'দিনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে সঞ্চালন করলেন তিলক সেনগুপ্ত ও পিয়ালী চক্রবর্তী এবং সমগ্র সম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য বাগনান শাখার শিল্পীদের ব্যবস্থাপনা উল্লেখনীয়। ■

শব্দরূপ-৮১২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১	২			৩		
৪			■	■		■	■
	■	■	৫	৬		৭	
৮	৯		■	৯	■	১০	■
■		■	১০	■	১১		১২
১৩		১৪			■	■	
■	■	১৬	■	■	১৫	১৬	
১৭							■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. যবনকুলে লালিতপালিত হয়েও হিন্দু ভগবানের নামকীর্তন ও প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের এই মহান ভক্ত, **৪.** মা গঙ্গার বাহন, **৫.** সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম, **৮.** জাঁকালো, উত্তম, **১১.** অশ্বপালক, **১৩.** ''কারার ওই —, ভেঙে ফেল কররে লোপাট'', **১৫.** দুর্ভিক্ষ, **১৭.** 'রূপসী বাংলা'-র কবি।

উপর-নীচ : ১. প্রেতবিশেষ যে মাটির নীচে পোঁতা ধন আগলায়, **২.** আশীর্বাদ, **৩.** অশ্বারোহী সৈন্যদল, **৪.** ফেলুদা এই অস্ত্র ব্যবহার করতেন, **৬.** কুস্তিগির, **৭.** রোজগার; অনুপস্থিতি, **৯.** বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, **১০.** মুখরতা; মুখ, **১২.** পুঁজি, অবলম্বন, **১৪.** মনগড়া বিষয়, **১৫.** মূলবিশেষ; শৃঙ্গবের (মসলা), **১৬.** শরতের সাদা ফুল।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৯
সঠিক উত্তরদাতা
মনোরঞ্জন বর্মন
কামাত, কোচবিহার
রমেন্দ্রনাথ রায়
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া

ম	স্থ	রা	■	অ	ষ্ট	ব	সু
ন	■	জ	■	ব	■	■	ষে
সা	■	যো	জ	ন	■	■	ণ
■	■	ট	■	ত	ত	■	■
■	■	ক	লি	■	বি	■	■
বে	■	■	পি	ঙ্গ	ল	■	জ
তা	■	■	ক	■	দা	■	বা
ল	ম্বো	দ	র	■	রি	সা	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮১২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

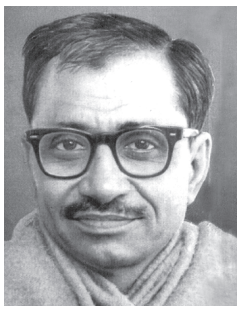

এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে বর্তমানে যৌথ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না এবং শুধু মালিকানার অধিকারটুকুই ভোগ করেন। যে শ্রমিকরা কারখানায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেন তাঁদের যন্ত্র ছাড়া কিছু মনে করেন না। ফলে মালিকদের বেঁচেবর্তে থাকা যাদের ভালোমন্দের ওপর নির্ভর করে সেই শ্রমিকরা সব সময় আপনত্বহীনতা অনুভব করতে থাকেন। নিঃস্পৃহ এই ভূমিকা ঠিক নয়। সেজন্য প্রয়োজন হলো শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদেরও মালিকানার অধিকার দেওয়া এবং লভ্যাংশ ও ব্যবস্থাপনায় অংশীদারি করা। পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে এভাবে শ্রমিকদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

* * *

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কষ্টিপাথর যেমন 'ভোটদান', তেমনই আর্থিক গণতন্ত্রের মানদণ্ড হলো 'সব হাতে কাজ'। কাজের এই অধিকার ভিখারি অথবা দাসমজদুরি (Slave Labour) সুলভ নয়। কাজ প্রথমে জীবিকার্জনের মাধ্যম হোক এবং অন্যের তা নির্বাচনের স্বাধীনতা যেন থাকে। যদি কাজের বদলে জাতীয় আয়ের ন্যায়সঙ্গত ভাগ না পাওয়া যায় তাহলে সেই কাজের গণনা ভিখারিদের মধ্যে হবে। এই দৃষ্টিতে ন্যূনতম বেতন, ন্যায়সঙ্গত বণ্টন এবং কোনো না কোনো প্রকার সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১৪

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

BHARATIYA HOMOEOPATHIC SAMAJ

৯এ অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬

—ঃ বিনম্র নিবেদন ঃ—

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ চিকিৎসক ও ছাত্রদের বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করে চলেছে বিগত ২৫ বছর। এছাড়া চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির আয়োজনের মাধ্যমে সমাজ সেবা করে আসছে। বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির সংরক্ষণ ও সেবাকাজের পরিচালনার জন্য কলকাতায় নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণকল্পে সমাজের সর্বশ্রেণীর সুধী নাগরিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সেবাব্রতী অছি পরিষদের কাছে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করছি।

লক্ষ্য ঃ ৭০০/৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট।

স্মৃতিফলক ব্যবস্থা ঃ ন্যূনতম দান দশ হাজার এবং ব্যক্তিগত ফলকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দান পঞ্চাশ হাজার।

অর্থসংগ্রহ ঃ আনুমানিক ৩০—৪০ লক্ষ টাকা।

–: Cheque/Draft should be drawn in favour of :– BHARATIYA HOMOEOPATHIC SAMAJ

–: For on line transfer :–

SB A/c. No.–31326410699, Branch SBI, Vivekananda Road, (Calcutta)

IFS Code–SBIN0001651, MICR No.–700002107

—ঃ বিশেষ যোগাযোগ ঃ—

সভাপতি ঃ ডাঃ সুকুমার মণ্ডল, মোবাইল নং-৯৪৩২১১৫০৩০, সহ-সভাপতি ঃ ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, মোবাইল নং-৯৪৩৩৮২০১৮৫

সাধারণ সম্পাদক ঃ ডাঃ নির্ঝর অধিকারী, মোবাইল নং-৯৮৩১৭১০৭৮৮,

সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ ডাঃ পার্থ কুণ্ডু, মোবাইল নং-৯৮৩১৪৯১৬৫৮, ডাঃ রাজীব রায়, মোবাইল নং-৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

সংবিধানের ৩৭০ ধারা কতটা অমোঘ বিচার করবে সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংবিধানের ৩৭০ ধারা কাশ্মীরের মানুষকে কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধে প্রদান করে, যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দারা পান না। কয়েক মাস আগে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষণ নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটি রায়ে জানিয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীরে ওই নীতি প্রযোজ্য নয়। তা না হলে ৩৭০ ধারা লঙ্ঘন করা হয়। হাইকোর্টের মতে ৩৭০ ধারা লঙ্ঘন করার ক্ষমতা সংবিধান কাউকে দেয়নি— এমনকী সংসদকেও নয়। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এস.এ. বোড়বে এবং অশোক ভূষণের যৌথ বেঞ্চ ৩৭০ ধারা বাতিল করা যাবে না— এমন অভিমতটি বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সীমান্তে ঠাণ্ডা পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের পাল্টা জবাবের তীব্রতা টের পেয়ে পাকিস্তান আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়েছে। গোয়ার সাংখালিম গ্রামে আয়োজিত একটি সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে খবরটি দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পরিকর বলেন, 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর পাকিস্তানের কাপুরুষোচিত হামলার ভালোই জবাব দিয়েছে আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী। এমন মুখের মতো জবাব পাবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের ডিজিএমও পর্যায়ের এক আধিকারিকের ফোন পেয়েছিলাম। তাঁর বক্তব্য, অনেক হয়েছে এবার গোলাগুলি বন্ধ করুন।' এই অনুরোধের জবাবে ভারত কী বলেছে তা-ও জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, 'যেহেতু কারও পাকা ধানে মই দেওয়া আমাদের স্বভাব নয় তাই সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে ভারতের কোনো আপত্তি নেই। শর্ত একটাই। পাকিস্তানকেও শান্তি বজায় রাখতে হবে।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
5 December - 2016 - Rs. 10.00,

IndianOil@Work
कार्यकलाप में आदर्श

संरक्षण
पर्यावरण और समुदाय की देखभाल

नवपरिवर्तन
सृजनात्मकता और अनुसंधान की भावना में अग्रणी होना

विश्वास
आजीवन संबंध विकसित करना

लगाव
पूरे लगाव के साथ आगे बढ़ने का संकल्प

इंडियनऑयल
IndianOil

2016
वर्ष सेवा और समर्पण का

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।